ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৩০ জুন ২০১৪

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মোহাম্মদ রফিক হাসান, *পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি*
নীনা শামসুন নাহার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি*
ম. নূরে আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি*
মোরশেদা আকতার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি*
মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, এ্যাসিসটেন্ট *ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি*

গবেষণা সহযোগী

রিদওয়ান মশরুর, গবেষণা সহযোগী

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র আউটরিচ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রিজওয়ান-উল-আলমকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়া উপস্থাপনার ওপর মতামত প্রদানের জন্য রিসার্চ এন্ড পলিসি বিভাগের এস. এম. আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার; ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার; দিপু রায়, প্রোগ্রাম ম্যানেজারসহ সকল সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কাজে অন্যান্য যারা বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন তারা হলেন রিসার্চ এন্ড পলিসি বিভাগের নাজমুল হুদা মিনা, মো. গোলাম মোস্তফা ও জাফর সাদিক চৌধুরীসহ সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এছাড়া টিআইবির ইয়েস মেম্বারদের সহযোগিতায় এ গবেষণাটি সমৃদ্ধ হয়েছে তাই তাদের প্রতি রইল ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org, advocacy@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জ্ঞান ভিত্তিক পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত/উপ-খাত/প্রতিষ্ঠান নিয়ে টিআইবি গবেষণা করে থাকে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

উন্নত জাতি গঠনে উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকার উচ্চ শিক্ষার প্রসারে ও ভর্তি সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে কার্যক্রম শুরু করেছে তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থী ভর্তির হারও বেড়ে যাচ্ছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার্থে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা কার্যক্রমে নানা ধরনের সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। তবে এ খাত নিয়ে বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর বিস্তারিত গবেষণার অভাব লক্ষ করা যায়। এই প্রেক্ষিতে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণে বিভিন্ন সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

টিআইবির গবেষণা পরিচালক মোহাম্মদ রফিক হাসানের নেতৃত্বে নীনা শামসুন্নাহার এবং নুরে আলম সহমোট ৫ সদস্যের একটি গবেষণা দল এই গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন। তথ্য সংগ্রহে তাদের আরো সহায়তা করেছেন গবেষণা ও নীতি বিভাগের নাজমুল হুদা মিনা, মো. গোলাম মোস্তফা, জাফর সাদিক চৌধুরী। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেছেন রিদওয়ান মশরুর। এছাড়াও টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

টিআইবি অন্যান্য গবেষণার মতো শুরু থেকেই এ গবেষণায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস ছিল, যাতে এ কর্মসূচিটি সম্পর্কে তাদের মূল্যবান মতামত পাওয়া গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাত করে তাদের মতামত নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। টিআইবির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনের উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ও পরিচালনায় সমস্যা ও অনিয়ম সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে সক্ষম হবে এবং বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক-নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচীপত্র

অধ্যায় এক ৪

ভূমিকা৪

১.১ প্রেক্ষাপট ৪

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা ৪

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৫

১.৪ গবেষণার পরিধি ৫

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ৫

- তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ৫
- তথ্য নিশ্চিতকরণ বা যাচাইকরণ ৬

১.৫.৪ গবেষণার সময় ৬

১.৬ সীমাবদ্ধতা ৬

১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো ৬

অধ্যায় দুই **৭**

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য **৭**

২.১ প্রাথমিক তথ্য **৭**

- সংখ্যা, অনুমোদনের সন, স্থায়ী সনদ, নিজস্ব জমি ও অবকাঠামো ৭
- বিভাগীয় বিন্যাস ৮
- প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তার ধরণ ৮
- শিক্ষার্থী, আসন সংখ্যা, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী, ডিগ্রি প্রদান ও বিনা খরচে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য ৮
- অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক, বিভাগ/অনুষদভিত্তিক তথ্য ১০
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ও আনপাতিক হার ১০
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক আয়- ব্যয় ও গবেষণা খাতে ব্যয় ১০

২.১ সরকারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পদক্ষেপ এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিবাচক অর্জন ১০

- সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ **১১**
- সরকারের নেতিবাচক পদক্ষেপ/উদ্যোগহীনতা **১১**
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিবাচক অর্জন **১১**

২.৩ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি কাঠামো **১১**

২.৪ বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি তদারকি প্রতিষ্ঠান **১১**

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় **১২**
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন **১২**

২.৫ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কাঠামো **১২**

২.৬ বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পূর্ণকালীন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সভা **১২**

২.৭ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ প্রক্রিয়া **১৩**

২.৮ উপসংহার **১৪**

অধ্যায় তিন **১৫**

আইনি কাঠামো ও সীমাবদ্ধতা **১৫**

৩.১ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি কাঠামো **১৫**

৩.২ আইনি কাঠামোর সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জন **১৫**

৩.৩ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক সমিাবদ্ধতা **১৫**

৩.৪ উপসংহার **১৭**

অধ্যায় চার **১৯**

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি **১৯**

৪.১ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি **১৯**

৪.২ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি ২৫
৪.৩ অন্যান্য পর্যবেক্ষণ ২৫
৪.৪ বিভিন্ন ধরণের লেনদেন ও জড়িত ব্যক্তি ২৭
৪.৫ উপসংহার ২৭

অধ্যায় পাঁচ **২৮**
তদারকি প্রতিষ্ঠান: মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি **২৮**
৫.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা ২৮
৫.২ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৮
৫.৩ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ২৮
৫.৪ উপসংহার ২৯

অধ্যায় ছয় **৩০**
উপসংহার ও সুপারিশ **৩০**
৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৩০
৬.২ অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ৩১
৬.৩ সুপারিশ ৩১

সারণির তালিকা

সারণি ১.২: প্রাথমিক তথ্যের উৎস ৬
সারণি ৪.১: এ খাতে বিভিন্ন ধরণের লেনদেন ও জড়িত ব্যক্তি ২৭

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১: অনুমোদনের সন: ১৯৯২-২০১৩ (৭৯টি) ৭
চিত্র ২.২: বিভাগ অনুসারে বিন্যাস (৭৯টি) ৮
চিত্র ২.৩: অনুমোদনের সন: ১৯৯২-২০১৩ (৭৯টি) ৮
চিত্র ২.৪: সরকারি ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র ৯
চিত্র ২.৫: বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ৯
চিত্র ২.৬: বিভাগ/ অনুষদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর হার ২০১২ ১০
চিত্র ২.৭ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কাঠামো ১২
চিত্র ২.৮: বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও কমিটির সদস্য ১৩
চিত্র ২.৯: বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ প্রক্রিয়া ১৩
চিত্র ২.১০: অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ৩০

বক্সের তালিকা

বক্স ১: চার কক্ষের বিশ্ববিদ্যালয়! ১৯
বক্স ২: মাননীয় মন্ত্রি ও এমপিকে না জানিয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি এবং একটি বৈধ ট্রাস্টি থাকার পরও সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বোর্ড গঠন ২০
বক্স ৩: 'ই' বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারতন্ত্রে বন্দি ২০
বক্স ৪: শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালার লংঘন ২২
বক্স ৫: ইউজিসির নীতিগত সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা ২২
বক্স ৬: অবকাঠামো না থাকা ২২
বক্স ৭: নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদনপত্র জমা, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একাধিক মন্ত্রীর সুপারিশ ২২
বক্স ৮: একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক চিত্র ২৩
বক্স ৯: 'ভ' বিশ্ববিদ্যালয় চিত্র ২৬
বক্স ১০: 'এ' বিশ্ববিদ্যালয় চিত্র ২৬
বক্স ১১: 'প' বিশ্ববিদ্যালয় চিত্র ২৭

ভূমিকা

১.২ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে শিক্ষাকে জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হল জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন এবং সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) উভয় দলিলেই দেশে সকল স্তরে মানসম্মত শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার বিশেষ অবদান ও গুরুত্ব রয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। প্রধান ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি ও বেসরকারী উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ ও সম্প্রসারণ, সর্বসাধারণের জন্য উচ্চ শিক্ষা সুলভকরণ, চাকুরীর বাজার উপযোগি ডিগ্রীর সুযোগ সৃষ্টি ও সেশনজটবিহীন স্বল্পসময়ে ডিগ্রি প্রভৃতি উদ্দেশ্যে নিয়ে ১৯৯২ সালে দেশে প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১৩ সালে ৫ লাখ ৬৯ হাজার ২৯৭ জন শিক্ষার্থী[১] উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করছে যা ২০১২ সালে ছিল ৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯৬৯ জন[২]। এই পাশ করা শিক্ষার্থীর বাইরেরও অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা চাকুরী জীবনে প্রবেশ করেও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সব মিলিয়ে বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনসংখ্যা ৫৯,২০০টি[৩]। ফলে খুব কম শিক্ষার্থী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। দেশের উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য উচ্চ শিক্ষা সুলভকরণ এবং এর মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বেসরকারী পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে এটি বর্তমানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ ও ব্যাপক সম্প্রসারণ, সর্বসাধারণের জন্য উচ্চ শিক্ষা সুলভকরণ, উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে স্থবিরতা দূর, চাকুরীর বাজার উপযোগি ডিগ্রীর সুযোগ সৃষ্টি, সেশনজটবিহীন স্বল্পসময়ে ডিগ্রি প্রদান করে উচ্চ শিক্ষার্থে বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভূমিকা পালন করছে। তবে, এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের ১৪ শতাংশ জনগন মনে করে শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত বা উচ্চ মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত।[৪] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: শিক্ষা, ২০১৩ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে বেসরকারী খাতে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই খাতে অনিয়ম এবং দুর্নীতির উদ্ভব লক্ষ্যণীয়।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ২২ বছরে বেশকিছু ইতিবাচক অর্জন সত্ত্বেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করে অব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণহীনতা, বাণিজ্যিকিকরণসহ নানা ধরণের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতে, অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজমান অব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণহীনতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির একটি প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।[৫] দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হলেও এ বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার অপর্যাপ্ততা রয়েছে।[৬] সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি যে তিনটি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে শিক্ষা খাত

---

[১] দৈনিক প্রথম আলো, ৪ আগস্ট, ২০১৩।

[২] ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৯ জুলাই ২০১২।

[৩] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবেদন ২০১২, প্রকাশ নভেম্বর ২০১৩, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাতীত ৩২টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটসহ ৫৯,২০০; তন্মধ্যে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮,৮১৮ জন-আসন সংখ্যার অতিরিক্ত ভর্তি করা হয়েছে ৩৮২ জন।

[৪] গ্লোবাল করাপশান ব্যারোমিটার ২০১৩', ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল।

[৫] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবেদন ২০১২, পৃ: ২২৫।

[৬] দৈনিক যুগান্তর, '*৩২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নতুন বিভাগ খুলতে পারবে না*', ২২এপ্রিল, ২০১২; দৈনিক প্রথম আলো, '*৪৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক বিজ্ঞান পড়ানো হয় না*', ২২ এপ্রিল, ২০১২; দৈনিক সংবাদ, '*নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি অনিয়ম স্বেচ্ছাচারিতা*', ৪এপ্রিল, ২০১২; দৈনিক সংবাদ, '*দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি বন্ধের সুপারিশ*', ১এপ্রিল, ২০১২; দৈনিক ইনকিলাব, '*বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হালচাল*', ২৩ এপ্রিল, ২০১২; দৈনিক সমকাল, '*বিশ্ববিদ্যালয় যখন গ্র্যাজুয়েট তৈরির কারখানা*', ২৮ এপ্রিল, ২০১২; দৈনিক সমকাল, '*উচ্চ শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ*' ৪ ডিসেম্বর, ২০১২; দৈনিক যুগান্তর, '*বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আউটার ক্যাম্পাসে অবৈধ সনদ বাণিজ্য, শিগগির অভিযান নামছে ইউজিসি*', ১৪ নভেম্বর ২০১১; দৈনিক যুগান্তর, *বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমলনামা এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, বন্ধ হয়ে যেতে পারে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়*, ২৬ আগস্ট ২০১১; দৈনিক ইত্তেফাক, '*ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ভার্সিটির বিরুদ্ধে অনিয়মের তদন্ত শুরু*', ১৩ সেপ্টম্বর ২০১১; দৈনিক ইত্তেফাক, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার নামে বাণিজ্য, ল্যাবরেটরি ছাড়াই পড়ানো হয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১১; দৈনিক ইনকিলাব, '*দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট বানিজ্য: মন্ত্রী এমপি কোটায় নিয়োগ পাচ্ছেন অনেকেই*', ৮ আক্টোবর; ২০১১; দৈনিক যুগান্তর, 'বেসরকারি ভার্সিটিগুলোতে ফের রমরমা শিক্ষা বাণিজ্য শুরু', ৩ জুলাই, ২০১১, দৈনিক যুগান্তর, *বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দোটানায় সরকার, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম*, ১৪ জানুয়ারি, ২০১২, দৈনিক প্রথম আলো, '*দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ভর্তি হলেই সনদ মেলে ঠাকুরগাও ক্যাম্পাসে!*', ২০ আগস্ট, ২০১০; দৈনিক প্রথম আলো, *মালিকদের দ্বন্দ্বে ছয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতা*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২; দৈনিক প্রথম আলো, দেশজুড়ে অবৈধ শাখায় চলছে শিক্ষা বাণিজ্য, ২৯ আগস্ট, ২০১০; দৈনিক প্রথম আলো, '*শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং, ২২ বিশ্ববিদ্যালয়কে লাল সংকেত*', ১৩ ডিসেম্বর ২০১০; দৈনিক প্রথম আলো, *নিজস্ব ক্যাম্পাস ছাড়াই চলছে ৪৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা না করায় বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে*', ১২ ডিসেম্বর, ২০০৯।

তার মধ্যে অন্যতম এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপরে গবেষণার অংশ হিসেবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ সুপারিশ করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা;
২. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনসমূহের সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা;
৩. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন চিহ্নিত করা এবং
৪. সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

১.৮ গবেষণার পরিধি

গবেষণায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত আইন বিবেচনায় এনে এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস/ স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা পর্যালোচনা করা হয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ ও মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে এবং অংশীজন হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৯ গবেষণা পদ্ধতি

মূলত এটি একটি গুণগত গবেষণা। তবে গবেষণার প্রয়োজনে প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের কৌশলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাতকার, দলীয় আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রবন্ধ/প্রতিবেদন পর্যালোচনা। প্রাথমিক তথ্যের উৎস হলো নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে নিবিড় সাক্ষাতকার, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে দলীয় আলোচনা। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হলো সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রতিবেদন, নাগরিক সনদ, সংবাদ-মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ট্রাস্টি বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, ভিসি, প্রভিসি, সিন্ডিকেট সদস্য, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। দলীয় আলোচনাগুলো শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাথে করা হয়েছে। এছাড়া সব ধরনের অংশীজনের সমন্বয়ে পরামর্শ সভা করা হয়েছে। মোট ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য থেকে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট বিভাগ থেকে থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। ঢাকা থেকে ১৮টি; ঢাকার বাইরে থেকে ৪টি (চট্টগ্রাম ২, সিলেট ২) নেয়া হয়েছে।

নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, অবস্থান (ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে); বিশেষায়িত বনাম সাধারণ; স্থায়ী সনদ আছে এবং স্থায়ী সনদ নেই; নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে এবং নেই; এনজিও উদ্যোগ ও ব্যক্তি উদ্যোগ; শিক্ষার্থী-অভিভাবকের পছন্দের তালিকা এবং পছন্দের বাইরের তালিকা। জুন ২০১২ থেকে মে ২০১৪ পর্যন্ত গবেষণা করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজন এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

২.১.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, পরামর্শ সভা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং সীমিত অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (সারণি ১.১)। এছাড়া নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তদারকি অংশীজনের সাথে গবেষণাকালীন সময়ে একাধিকবার যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্ত তথ্যের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রহণ করা হয়। একাধিক দীর্ঘ নিবিড় সাক্ষাতকার ছাড়াও একটি সংস্থা লিখিতভাবে তথ্য প্রদান করে।

সারণি ১.২: প্রাথমিক তথ্যের উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের টুল	তথ্যের উৎস	সংখ্যা
প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ	চেকলিস্ট	▪ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী	২২টি বিশ্ববিদ্যালয়
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	▪ বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিনিধি, অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী, অধ্যয়রত শেষ করা শিক্ষার্থী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক	৫৫ জন
দলীয় আলোচনা	চেকলিস্ট	▪ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক	৩টি
পরামর্শ সভা	চেকলিস্ট	▪ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন	১টি
পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট	▪ বিশ্ববিদ্যালয়	২২টি

১.৫.৪ তথ্য নিশ্চিতকরণ বা যাচাইকরণ

প্রাপ্ত তথ্য একাধিক সূত্র থেকে ট্রায়াঙ্গুলেশন পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করা হয়। তথ্য সমূহের আভ্যন্তরীণ সংগতি এবং একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত হবার পর তথ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এটি একটি গুণগত গবেষণা। তথ্যদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত গুণগত তথ্য এবং পরিমাণগত তথ্য সাধারণীকরণের জন্য ব্যহার করা যায় না। গবেষণায় প্রাপ্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরণের ফলাফলের জন্যই একথা সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাপ্ত তথ্য সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজন এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারনা দেয়।

১.৫.৪ গবেষণার সময়

২০১২ এর জুন থেকে শুরু করে ২০১৪ এর জুন পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

১.১০ সীমাবদ্ধতা

অনেকক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষাতকার একাধিকবার যোগাযোগ করেও নিশ্চিত করা যায়নি। নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক তথ্যদাতা অস্বস্তি বোধ করেছেন।

১.১১ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আইনি বিষয়গুলোর লজ্ঞণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা পালন করে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসন পর্যালোচনার আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রাসঙ্গিক তথ্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য

জনসংখ্যার অনুপাতে দেশে উচ্চ শিক্ষার চাহিদার তুলনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল ও আসন সংখ্যা অপর্যাপ্ততার কারণে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিশেষ করে, জাতীয় শিক্ষা বাজেটে উচ্চ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ঘাটতি থাকার কারণে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে স্থবিরতা দেখা দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও জাপানের আদলে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। সে অনুসারে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২ জারি করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত (২০১৪) বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে।[৭]

- **সংখ্যা, অনুমোদনের সন, স্থায়ী সনদ, নিজস্ব জমি ও অবকাঠামো**

বর্তমানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৯টি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর মধ্যে ২০০৩ এবং ২০১২ সালে সর্বাধিক (১৬টি করে দু'বছরে ৩২টি) বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পায়। তবে, ১৯৯৪, ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ এবং ২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সময়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পায়নি। ২২ বছরে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ এক রৈখিক নয়। ধারাবাহিক, দীর্ঘমেয়াদী ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অনুপস্থিতি এ ধরণের সম্প্রসারণের পেছনে দায়ী হতে পারে।

চিত্র ২.১: অনুমোদনের সন: ১৯৯২-২০১৩ (৭৯টি)[৮]

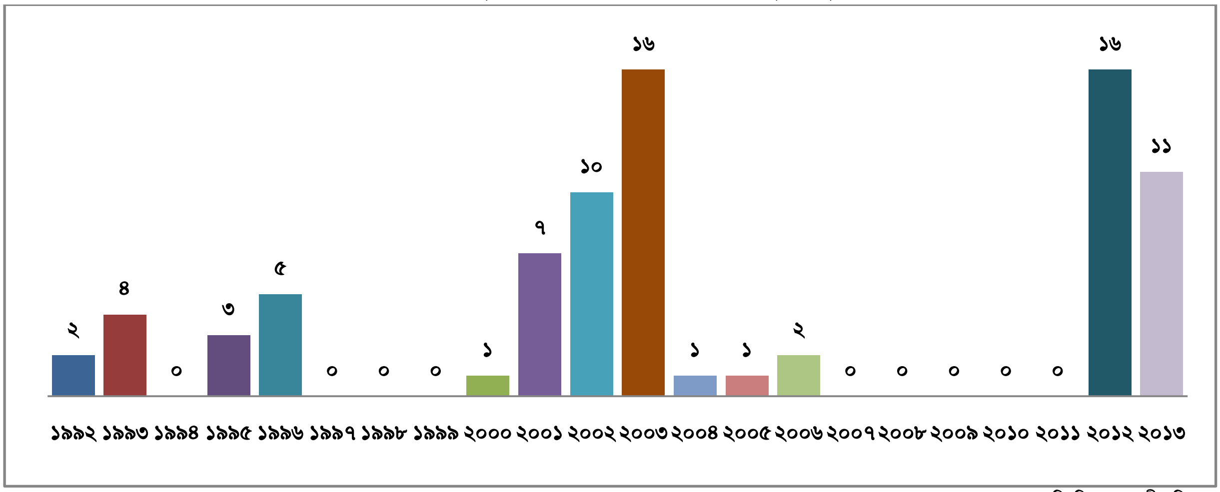

সূত্র: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৯টি, এর মধ্যে কার্যকর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৮টি। ২০১২ সালে কার্যকর ছিল ৬০টি।[৯] আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়[১০]। ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ পর্যন্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী সনদ লাভ করে মাত্র ২টি[১১]। সাময়িক অনুমোদনের শর্ত হিসেবে স্থায়ী ক্যাম্পাসে ১৭টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। ৫টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণাধীন। ২১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পোসের জন্য জমি ক্রয় করেছে কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করেনি। ৫টি

[৭] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১৪।

[৮] প্রাগুক্ত।

[৯] ২০১২ সালে কার্যকর ছিল ৬০টি।

[১০] কুইন্স ইউনিভার্সিটি ও আমেরিকান বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি।

[১১] আহসানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অভ সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি এবং সিটি ইউনিভার্সিটি (শর্তসাপেক্ষে)।

বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনের[১২] নামে ক্রয়কৃত জমিতে নির্মিত অবকাঠামোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য অল্প পরিমাণ জমি ক্রয় করেছে অর্থাৎ আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমি ক্রয় করেনি।[১৩]

- **বিভাগীয় বিন্যাস**

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ঢাকা বিভাগে অবস্থিত ৫৬টি (প্রায় ৭০ শতাংশ)। চট্টগ্রামে ১১টি, রাজশাহী ৫টি, সিলেটে ৪টি, খুলনায় ২টি এবং বরিশালে ১টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। তবে রংপুর বিভাগে কেনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

চিত্র ২.২: বিভাগ অনুসারে বিন্যাস (৭৯টি)[১৪]

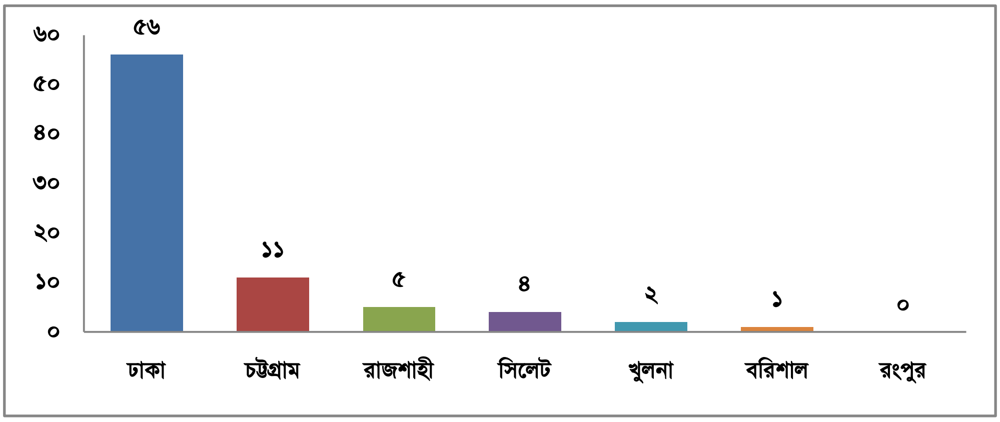

সূত্র: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

- **প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তার ধরণ**

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তার ধরণ পর্যবেক্ষণে প্রধানত: ব্যবসায়ী প্রায় ২৯.৬ শতাংশ, শিক্ষাবিদ ২২.৫ শতাংশ এবং রাজনীতিবিদ ৮.৫ শতাংশ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে (২০১২), 'ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের বেশিরভাগ সদস্য ব্যবসায়ী'।

চিত্র ২.৩: অনুমোদনের সন: ১৯৯২-২০১৩ (৭৯টি)[১৫]

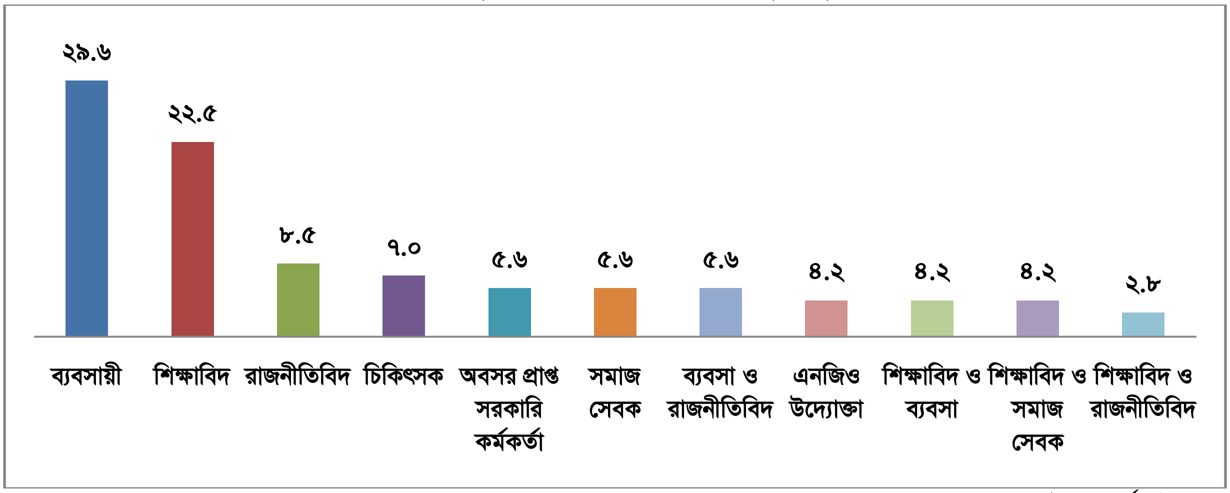

সূত্র: গবেষক দল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

- **শিক্ষার্থী, আসন সংখ্যা, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী, ডিগ্রি প্রদান ও বিনা খরচে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য**

---

[১২] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২, এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ ছিল।

[১৩] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে প্রাপ্ত লিখিত তথ্য, ২০১৪। ২০১২ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আইন অনুযায়ী নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে ১১টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি নেই ৫০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ৫-১৯ বছরের মধ্যে (চেক)।

[১৪] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ২০১৪।

[১৫] প্রাগুক্ত।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে[১৬] ২০০৬ সালে শিক্ষার্থী ছিল ৫৫.২২ শতাংশ যেখানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৪.৭৪ শতাংশ যা বর্তমানে (২০১২) যথাক্রমে ৩৮.৫৩ শতাংশ এবং ৬১.৪৬ শতাংশ।

চিত্র ২.১: সরকারি ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যার তুলনামূলক চিত্র[১৭]

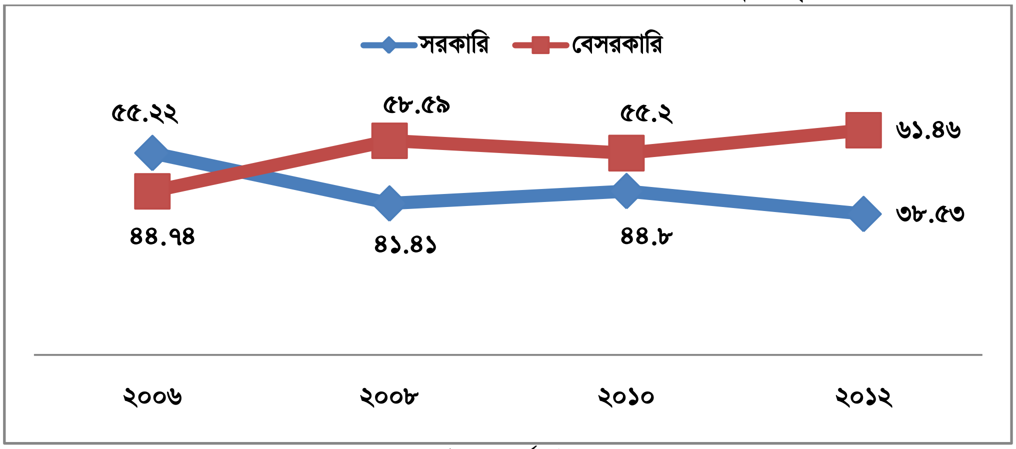

সূত্র: গবেষক দল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,১৪,৬৪০ জন। বিগত সাত বছরের মধ্যে ২০০৮ এ শিক্ষার্থীর শতকরা বৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে কম (৭ শতাংশ), ২০০৯ সালে ১০ শতাংশ, ২০১০ সালে ০.১৪ শতাংশ কমে ৯.৫৮ শতাংশ, ২০১১ সালে ১৭.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.২১ শতাংশ, ২০১২ সালে ১৫.১৭ শতাংশ কমে ১২.০৪ শতাংশ।[১৮]

চিত্র ২.১: বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি[১৯]

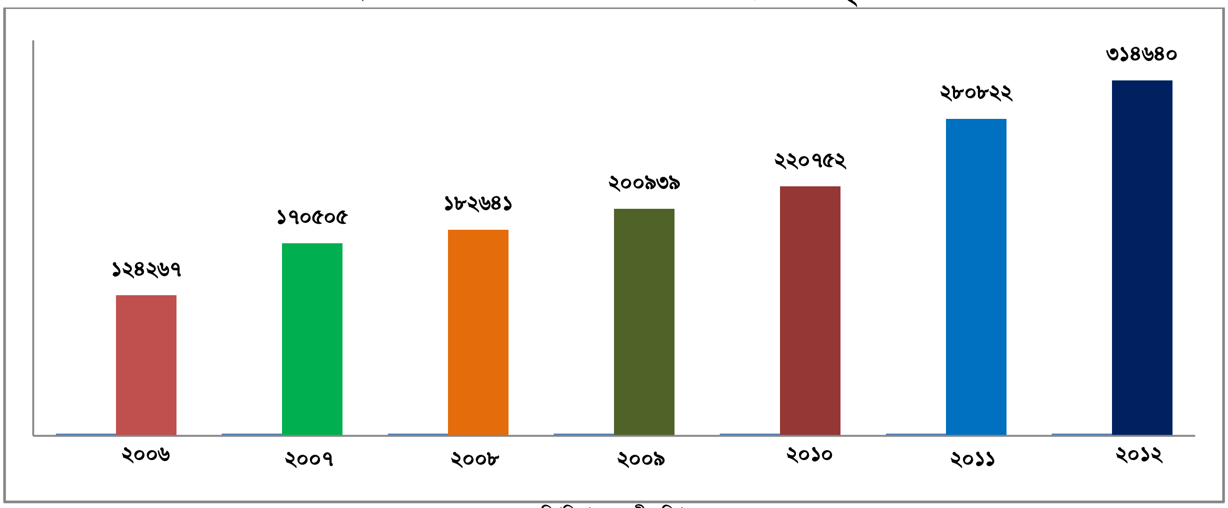

সূত্র: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,১৪,৬৪০ জন, এর মধ্যে ছাত্রী ৭৯,২৩৪ জন এবং ছাত্র ২,৩৫,৪০৬ জন। বিদেশী শিক্ষার্থী ১,৬৪২ জন। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক সংখ্যক ১২৩৭ জন বিদেশী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২৬। স্নাতক সম্মান ১ম বর্ষে আসন সংখ্যা ১,৩১,৯৩২টি, কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি ৫২৫৪০টি আসন (৩৯.৮২%)। সর্বমোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,১১,৯৪৪ জন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ৭৪.৮ শতাংশ, ছাত্রী ২৫.২ শতাংশ। স্নাতক পাস পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৭৩০ জন, ছাত্রী ৩০৮ জন, স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৯৩৯২ জন, ছাত্রী ১৯৮৬১ জন, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৯২৪৫ জন, ছাত্রী ৭৯৬১ জন। ২০১২ সালে বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রি লাভ ৪৯১৮০জন শিক্ষার্থী, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২৮৭৪ জন এবং সর্বনিম্ন ডিগ্রি ১ জন প্রদান করা হয়েছে।

---

[১৬] এক্ষেত্রে ননটিচিং বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

[১৭] বেনবেইজ তথ্য ও ৩৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন; প্রকাশিত নভেম্বর ২০১৩।

[১৮] ৩৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন; প্রকাশিত নভেম্বর ২০১৩।

[১৯] ৩৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন; প্রকাশিত নভেম্বর ২০১৩; ৬০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু বার্ষিক ব্যয় গড় ৭৮২৬৬ টাকা। বিনা খরচে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ২১,৪৭৪ জন এর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ৩,৪১৯ জন (২.৫৯ শতাংশ) ; দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ৭,৬২১ জন (১৩.২৩ শতাংশ)। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ বছরে (২০১২ সনে) সর্বমোট ডিগ্রি প্রদান করেছে ৪৯,১৮০জন শিক্ষার্থী (একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রদান করেছে ২৮৭৪ জনকে এবং অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন ১ জনকে ডিগ্রি প্রদান করেছে)।

- **অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর ডিগ্রিভিত্তিক, বিভাগ/অনুষদভিত্তিক তথ্য**

বিভাগ/ অনুষদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর হার (২০১২) পর্যালোচনায়, ব্যবসায় প্রশাসন ৪২.৩৩ শতাংশ; চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি বিজ্ঞান ও ফার্মাসীতে ৩৩.৭৭ শতাংশ; কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, শিক্ষা ও আইনে ২৩.৬৩ শতাংশ; সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা ও পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ০.২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত।

চিত্র ২.১: বিভাগ/ অনুষদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর হার ২০১২

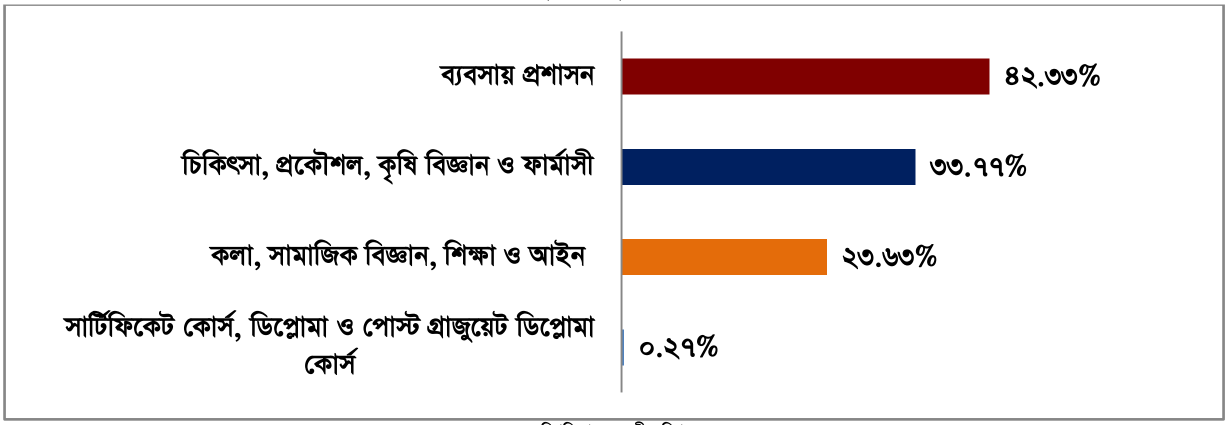

সূত্র: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

- **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ও আনুপাতিক হার**

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক সংখ্যা ১১৭৫৫ জন যেখানে পূর্ণকালীন শিক্ষক ৭৮২০ জন (৬৭.৫ শতাংশ) এবং খন্ডকালীন শিক্ষক ৩৯৩৫ জন (৩২.৫ শতাংশ)। নারী শিক্ষক রয়েছে ৩৩২০ জন (পূর্ণকালীন: ৮৪.০৩ শতাংশ ও খন্ডকালীন ১৫.৯৬ শতাংশ)। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত হচ্ছে ১:২৬।

- **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক আয়- ব্যয় ও গবেষণা খাতে ব্যয়**

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বমোট আয়ের পরিমাণ প্রায় ১৮৩৯০৫.৮৩ লক্ষ টাকা, গড় আয় প্রায় ৩১১৭.০৫ লক্ষ টাকা। সর্বোচ্চ আয় ১৫৭৭৪.১৮ লক্ষ এবং সর্বনিম্ন আয় ৯৯.৫৮ লক্ষ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৭০৪৩৯.১৯ লক্ষ টাকা। এ ব্যয়ের বেশিরভাগ ভৌত অবকাঠামো, গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরি নির্মাণও উন্নয়ন ব্যয় করা হয়[২০]। গড় ব্যয় প্রায় ২৮৮৮.৮০ লক্ষ টাকা (সর্বোচ্চ ব্যয় ১৩৬৯৮.৫৬ লক্ষ- সর্বনিম্ন ব্যয় ৪২ লক্ষ)। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ৭টি আয় ব্যয় সমান, ১৫টি বার্ষিক ব্যয় আয়ের থেকে বেশী, ৩৮টি বার্ষিক ব্যয় আয়ের থেকে কম। শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু ব্যয় ৪৬১৭৭৪৭.৩১ টাকা, গড় ৭৮২৬৬.৯০ টাকা। সর্বোচ্চ ব্যয় ৫৪৩৬০৯ টাকা ও সর্বনিম্ন ব্যয় ৯৩৫৮ টাকা। আইনে গবেষণা কাজে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও গবেষণা কার্যক্রমে কোনরূপ অর্থ ব্যয় করেনি ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা কার্যক্রমে অর্থ ব্যয় করেছে ৪৫টি। গবেষণা খাতে সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪,১০৩.৮৪ টাকা (গড় ব্যয় ৯১.১৮ লক্ষ টাকা)।

২.২ সরকারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক পদক্ষেপ এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিবাচক অর্জন

- **সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ**

ইতোমধ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকারের ইতিবাচক কিছু পদক্ষেপ লক্ষ করা গেছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনি সংস্কার (বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন); অননুমোদিত প্রোগ্রাম/ কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করার নির্দেশ; সকল আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ (ইতিমধ্যে ৪০টি উচ্ছেদ); দীর্ঘসূত্রীতা নিরসনে সব মামলা একই বেঞ্চে আনার উদ্যোগ; সাময়িক অনুমোদন প্রাপ্তির ৫ বছর অতিক্রান্ত সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ; যেসকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করেনি তাদের নতুন করে কোনো বিভাগ, প্রোগ্রাম, কোর্স অনুমোদন প্রদান না করার নির্দেশ দেওয়া; বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেপ্টেম্বর ২০১৫ এর

[২০] ৩৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন; প্রকাশিত নভেম্বর ২০১৩।

মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য সময় বেঁধে দেয়া; ইউজিসির ৪টি কমিটি সক্রিয় এবং আকস্মিক পরিদর্শনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে; ঢাকা শহরের মধ্যে নিজস্ব জমি না থাকলে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনে অনুৎসাহের নীতি; এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত, সংসদের স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নির্দেশনা (মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনিয়ম-দুর্নীতির ওপর ইউজিসি সত্যায়িত প্রতিবেদন পেশ) ইত্যাদি।

- **সরকারের নেতিবাচক পদক্ষেপ/উদ্যোগহীনতা**

তবে ইতিবাচক উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারের উদ্যোগহীনতা/নেতিবাচক কিছু পদক্ষেপ লক্ষ করা গেছে। সেগুলোর মধ্যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সুষ্ঠু ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব; বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা তৈরি না করা; বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল বৃদ্ধি না করা; পৃথক একটি কমিশন গঠন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইউজিসিকে অধিকতর ক্ষমতায়িত না করা; ২০১০ এর আইনে একটি জাতীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন করার কথা বলা হলেও ৪ বছরেও গঠন সম্পন্ন না করা। এছাড়া বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪ এর মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন করা; অধিকতর অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টি (অবকাঠামো সংক্রান্ত শর্ত শিথিল -নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাস, কোন ধরণের মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুযোগ পাবে তার মাপকাঠি অনির্ধারিত, ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের কাজের চাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি)।

- **বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিবাচক অর্জন**

বিগত ২২ বছরে ক্রমাগত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বর্তমানে এর মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা থেকেও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয়সাপেক্ষ হলেও কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে। অন্যান্য অর্জনের মধ্যে বিদেশগামীতার বিকল্প হিসেবে ভূমিকা রাখছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে; বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা বিদেশে বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন, এবং অন্যান্য প্রতিযোগীতামূলক চাকুরী বাজারে প্রবেশ করছেন; অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে -বিশেষতঃ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই কর্মজীবনে প্রবেশ করেছেন তাদের জন্যে; দরিদ্র/মেধাবী/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের জন্য বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি; বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (বর্তমানে ৩৪টি দেশের ১৬৪২ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত); শুধুমাত্র নারীদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; শিক্ষার্থীদের জন্যে পরিবহন সুবিধা, নারীদের জন্যে পৃথক আবাসিক সুবিধা; শিক্ষক যোগ্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে 'ডেমোনেস্ট্রেশন লেকচার /বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা', শিক্ষা-শিখণে আধুনিক উপকরণ ও ধারার ব্যবহার - মাল্টিমিডিয়া /ওভারহেড প্রজেক্টর, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত এসাইনমেন্ট প্রদান, প্রজেক্ট /ফিল্ড ওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন ইত্যাদি।

এছাড়া শিক্ষক মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান, চাকুরীর বাজারে চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন নতুন বিভাগ/কোর্স চালু (বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং , বায়োইনফরম্যাটিক্স); চাকুরীর ২ বছর অতিক্রান্ত হলে শিক্ষকদের জন্যে 'শিক্ষা ছুটির' সুযোগ, দরিদ্র মেধাবী/মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের জন্যে বাধ্যতামূলক বৃত্তির বাইরেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি (১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিভোগীর গড় হার ৬০ শতাংশ), বোর্ড অব ট্রাষ্টির ইতিবাচক উদ্যোগ ও ভূমিকার মাধ্যমে মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ইমেজ সৃষ্টি।

২.৩ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি কাঠামো

বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালগুলো বর্তমানে 'বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' যা ২০১০ সনের ৩৫ নং আইন (১৮ জুলাই ২০১০ প্রণীত) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২' যা ১৯৯২ সনের ৩৪ নং আইন (৯ আগস্ট ১৯৯২ এ প্রণীত) দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আইনটি 'বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮' যা ১৯৯৮ সনের ৩ নং আইন (৫ এপ্রিল ১৯৯৮ প্রণীত) নামে একবার সংশোধন করা হয়েছে।[২১] এছাড়া এবছর 'বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪' জারি করা হয়।

২.৪ বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি তদারকি প্রতিষ্ঠান

- **শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

আইন প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট কাজ করা, তদারকি কাজ অব্যহত রাখা, উন্নীত করা ও সমন্বয় করার মাধ্যমে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা, পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে রিপোর্টিং করা- প্রতিবেদন গুরুত্ব না দেয়া, বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ ও

[২১] বিস্তারিত পরের অধ্যায়ে।

পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদান করলে তা পর্যালোচনা করা ও অনুমোদন প্রদান করে। পাশাপাশি ভিসি, প্রভিসি ও ট্রেজারারের সার্বিক তথ্য পর্যালোচনা করে অনুমোদন প্রদান করে।

- **বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন**

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ ও পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ প্রদান করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করা হলে তার অনুমোদন সংক্রান্ত কাজ (সাময়িক অনুমতি প্রদান বা অনুমতি প্রদান না করার সুপারিশ, শুনানী সংক্রান্ত কাজ, সনদপত্রের জন্য আবেদন গ্রহণ, যাচাই, অনুমোদন) সাময়িক অনুমতি এবং সনদ প্রদানে বিষয়গুলো মনিটরিং, সাময়িক আবেদনপত্র নবায়ন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান প্রক্রিয়া বন্ধ হলে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান, নতুন ক্যাম্পাস পরিদর্শন পূর্বক অনুমোদন, শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণা বিষয় নির্ধারণ, ইন্সটিটিউট স্থাপনের অনুমোদন, সিন্ডিকেটে প্রতিনিধি প্রেরণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুমোদন, নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ অনুমোদন, খন্ডকালীন শিক্ষকদের ছাড়পত্র জমা রাখা, নিবিড় পাঠক্রম অনুমোদন, প্রতি বিষয় এবং কোর্সে আসন সংখ্যা উল্লেখ করে অনুমোদন, শিক্ষার্থীর তালিকা গ্রহণ, গবেষণার জন্য বরাদ্দ নির্ধারণ, অনুমোদিত চাকুরীবিধি এবং বিশ্বদ্যিালয় সংবিধি কমিশনে গ্রহণ, বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

২.৭.২ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কাঠামো

বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বোর্ড অব ট্রাস্টি ও সিন্ডিকেট মূলত: প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। এছাড়া আরো ৭টি কমিটি যেমন একাডেমিক কাউন্সিল, ইন্সটিটিউট, অনুষদ, অর্থ কমিটি, পাঠক্রম কমিটি, শিক্ষক নিয়োগ কমিটি, শৃঙ্খলা কমিটি মাধ্যমে তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রয়োজনের চ্যান্সেলরের অনুমতিক্রমে আরো কমিটি গঠন করা যেতে পারে। শুধু পাঠ্যক্রম কমিটিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বিশেষজ্ঞ রাখা হয়েছে। তবে, সবগুলো কমিটিতেই ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার ও ভিসি মনোনীত প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।

চিত্র: ২.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা কাঠামো

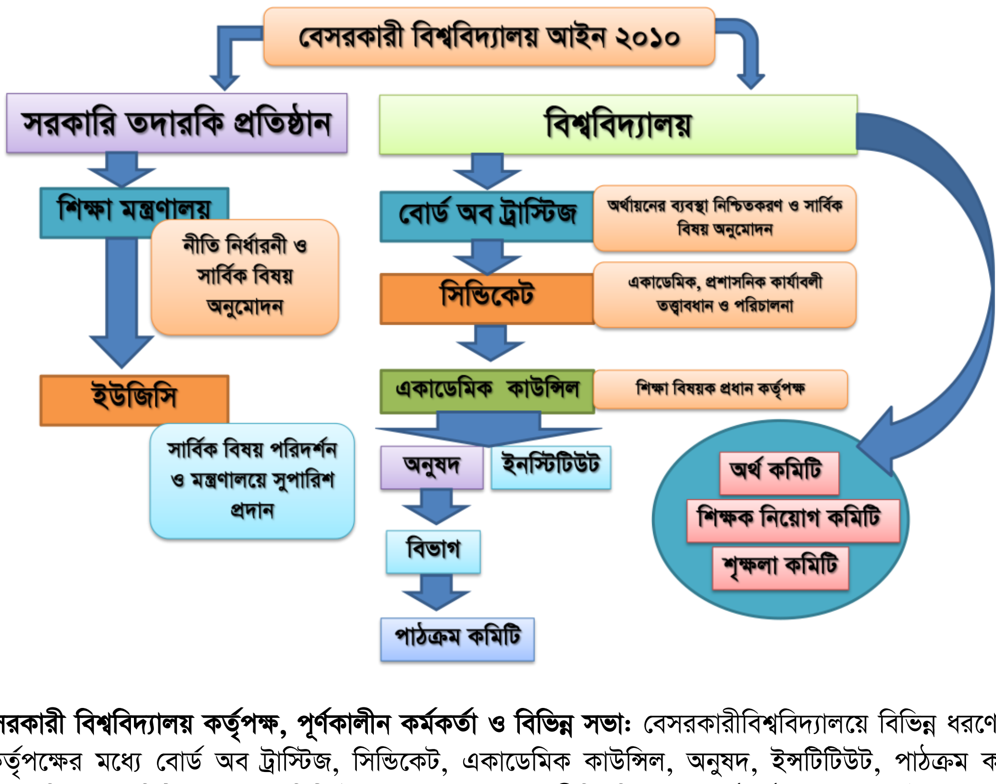

২.৫.২ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পূর্ণকালীন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সভা: বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের কর্তৃপক্ষ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের মধ্যে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অনুষদ, ইন্সটিটিউট, পাঠক্রম কমিটি, অর্থ কমিটি, শিক্ষক নিয়োগ কমিটি, শৃঙ্খলা কমিটি উল্লেখযোগ্য। বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তাদের মধ্যে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ডীন বা ডাইরেক্টর, রেজিস্টার, প্রক্টর, বিভাগীয় ডীন, উপদেষ্টা (ছাত্র কল্যাণ), পরিচালক (অর্থ), জনসংযোগ কর্মকর্তা, লাইব্রেরিয়ান ইত্যাদি। নিম্নে কয়েকটি কর্তৃপক্ষ ও কমিটির সদস্যদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ধরণ দেখানো হলো:

চিত্র ২.৫: বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও কমিটির সদস্য

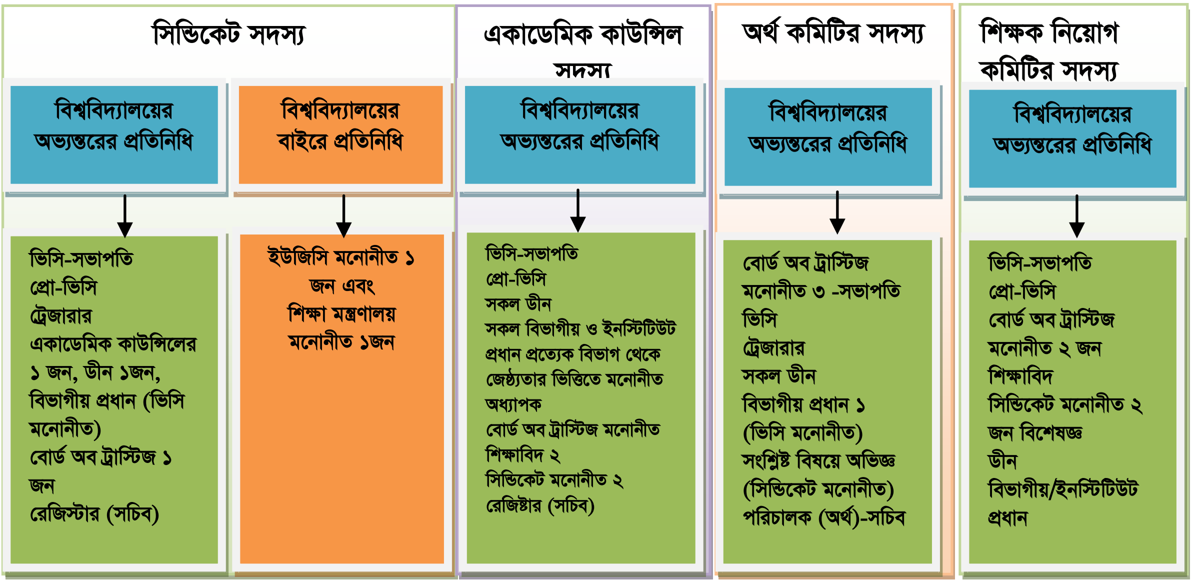

বোর্ড অব ট্রাস্টি, সিন্ডকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও অর্থ কমিটির মোট সভা হয় ৬৬২টি (গড় সভা ১১টি)। কোন ধরণের সভা অনুষ্ঠিত হয়নি ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বোর্ড অব ট্রাস্টির সভা হয় ২৪৫টি, গড় ৪টি। সিন্ডকেট সভা হয়েছে ১৫৩টি, গড় ৩টি। একাডেমিক কাউন্সিল সভা হয়েছে ১৩৫টি, গড় ২টি। অর্থ কমিটির সভা হয়েছে ১২৯টি, গড় ২টি।[২২]

২.৫.২ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ প্রক্রিয়া

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বোর্ড অব ট্রাস্টি কর্তৃক মনোনীত ভসি, প্রভিসি ও ও ট্রেজারারের নাম প্রস্তাব করার পর চ্যান্সেলর অনুমোদন প্রদান করেন। এক্ষেত্রে ভিসি প্রভিসি ও ট্রেজারার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ৩ জনের নাম মনোনীত করে পাঠাতে হয়। এছাড়া রেজিস্টার, লাইব্রেরিয়ান ও অন্যান্য কর্মকর্তা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় যেখানে ভিসি, প্রো-ভিসি থাকেন এবং বোর্ড অব ট্রাস্টি, সিন্ডকেট এবং ভিসি মনোনীত প্রাপ্তি থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কেউ এখানে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।

চিত্র ২.৬ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ প্রক্রিয়া

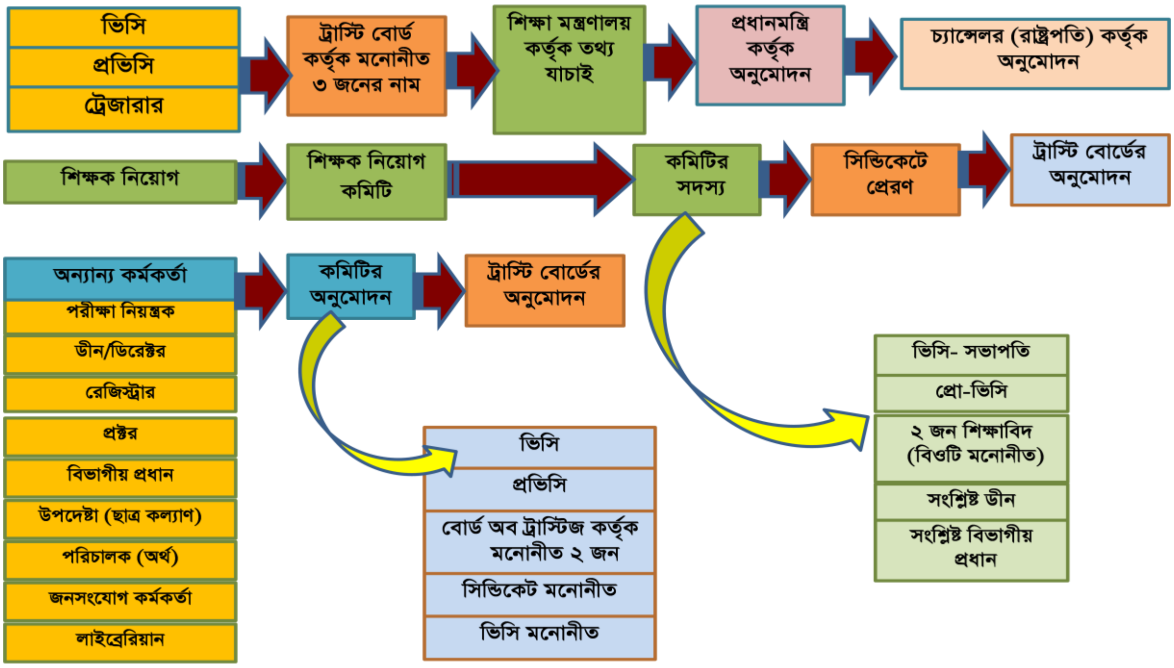

[২২] বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবেদন ২০১২।

২.১১ উপসংহার

এ অধ্যায়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সরকারের চলমান কার্যক্রম ও অর্জন, সংশ্লিষ্ট তদারকি প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন ও আইনের প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় তিন

আইনি কাঠামো ও সীমাবদ্ধতা

এই অধ্যায়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো আলোচনা করা হলো। আইনি কাঠামো আলোচনার পাশাপাশি আইনি সীমাবদ্ধতা ও আইনের প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে।

৩. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি কাঠামো

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যেসব আইন, সংবিধি ও নীতিমালা অনুযায়ী এর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, সেগুলো হলো, 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২', 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ (সংশোধনী)', 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০'। এছাড়া এবছর 'বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪' জারি করা হয়। ২০১০ এর আইনে উল্লেখ রয়েছে, এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের আইন রহিত হবে এবং রহিত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য ২০১০ আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত বলে গণ্য হবে। রহিত আইনের অধীনে স্থাপিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে এই আইনের অধীন আবশ্যক সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুশীলন ও প্রতিপালন করতে হবে।

৩.১ আইনি কাঠামোর সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জন: 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' এর নতুন আইনে কিছু বিষয় সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। নতুন আইনে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা সংশ্লিষ্ট বিষয়, অনুমোদন সংশ্লিষ্ট বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব, ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, সিন্ডিকেটের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে আইন অমান্যকারীকে শাস্তি বা দন্ডের আওতাভুক্ত, মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি (সিন্ডিকেটে ইউজিসির ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ), ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য সংখ্যা নতুন আইনে বৃদ্ধি (অনধিক ২১ জন), বাৎসরিক বাজেটের ব্যয় খাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ গবেষণার জন্য বরাদ্দপূর্বক ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, আউটার ক্যাম্পাস স্থাপন বন্ধ করা, সাময়িক অনুমতিপত্র বাতিল করে বন্ধ ঘোষণা করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের অনুমোদনের জন্য আবেদন করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।[২৩] নতুন আইনের ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ৩ কোটি টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ১.৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ১.৫ কোটি টাকা করা হয়েছে।[২৪] আইনে বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার জন্য মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকার এবং গবেষণা কাজে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য থাকার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫] আইনে বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ১ একর এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ২ একর জমির শর্ত দেয়া হয়েছে আগের আইনে যা ছিল ৫ একর।[২৬] আইনে বলা হয়েছে, বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতির মেয়াদ হবে ৭ বছর। পূর্বের আইনে ছিল ৫ বছর।[২৭] আইনে কোনো বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় ৭ বছর পর আরো ৫ বছর বৃদ্ধি করে নবায়নের সুযোগ পাবে বলে উল্লেখ করা হয়।[২৮]

৩.২ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক সমিবদ্ধতা

৩.২.১ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কিছু বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব রয়েছে। এছাড়া 'বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২' আইনটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা পরীবিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত নির্দেশনাযুক্ত ছিল। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকা, সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবিধি না থাকা; সংবিধি পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বাধ্যতামূলক এখতিয়ার না থাকা নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়:

[২৩] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০, ধারা ৩ উপধারা ৩।
[২৪] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০, ৬ ধারার ৯ উপধারা।
[২৫] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০, ৯ ধারায় ৬ উপধারা।
[২৬] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০, ৯ ধারা ১ উপধারা।
[২৭] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০, ৭ ধারার উপধারা ২।
[২৮] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০, ১১ ধারার উপধারা ২।

- **প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টির নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃত্বের ঝুঁকি সৃষ্টি:** আইনে বোর্ড অব ট্রাস্টিকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরণের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যেখানে বিওটি কর্তৃক ভিসি, প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রার মনোনয়ন; সকল ধরনের পদ সৃষ্টি, সৃষ্ট পদের দায়িত্ব কর্তব্য, চাকুরীর শর্তাবলী, বেতনক্রম, সকল প্রকার শিক্ষার্থী ফি নির্ধারণ ও নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব অনুমোদন, অডিট ব্যবস্থাকরণ; ১০ সদস্য বিশিষ্ট সিন্ডিকেটে মনোনীত ভিসি, প্রোভিসি, ট্রেজারার ছাড়াও সরাসরি আরো ১ জন বিওটি সদস্য, ভিসি মনোনীত ৩ জন, রেজিস্ট্রার সদস্য-সচিব; রেজিস্ট্রার ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্যে আইনানুযায়ী গঠিত ৭ সদস্যের কমিটিতে ভিসি, প্রোভিসি ছাড়াও আরো ২ জন বিওটি মনোনীত প্রতিনিধি, এছাড়া সিন্ডিকেট মনোনীত ২ জন প্রতিনিধি; শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে ভিসি, প্রোভিসি ছাড়াও আরও ২ জন 'শিক্ষাবিদ' প্রতিনিধি প্রেরণ; ৯ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ কমিটিতে ভিসি, ট্রেজারার ছাড়াও সরাসরি আরও ৩ জন সদস্য যার একজন সভাপতি (এই কমিটিতে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত নিয়োগপ্রাপ্ত অর্থ-পরিচালক সদস্য-সচিব); একাডেমিক কাউন্সিলে ২ জন মনোনীত শিক্ষাবিদ প্রেরণ করার ক্ষমতা প্রদান করে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- **সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও মালিকানাবোধ ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে সহায়ক:** আইনত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান কারণ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা বা ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বাররা বিনিয়োগ করলেও কোনো ধরণের লভ্যাংশ বা বিনিয়োগের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু সরাসরি আইনে উল্লেখ না থাকায় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও মালিকানাবোধ ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে সহায়ক হিসেবে ইউজিসি প্রতিবেদনে 'মালিকানা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বোর্ড মেম্বারদের মালিক বলে সম্মোধন করছেন এবং সেধরণের মনোভাব স্বত:স্ফুর্তভাবে প্রকাশ করছেন।

- **ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট সভার সংখ্যা ও সম্মানী সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা** : অলাভজনক এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও আইনে ট্রাস্টি বোর্ড ও সিন্ডিকেট সভার সংখ্যা ও সম্মানী সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকায় বোর্ড সদস্যরা বিভিন্ন সভার মাধ্যমে সম্মানী গ্রহণ করছেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের কথা উল্লেখ করে বিদেশ ভ্রমন করছেন; সাধারণ তহবিলের টাকা ইচ্ছামত উত্তোলন করতে পারছেন এবং গাড়ী, জনবল ব্যবহার করছেন।

- **সাধারণ তহবিল ব্যয়ের বিষয়ে ইউজিসিকে জানিয়ে অর্থ ব্যয়ের নিয়ম থাকলেও তা কোন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে তা উল্লেখ নেই:** বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক ও সেবামূলক খাত হলেও এটির আয়কৃত অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হচ্ছে সেবিষয়ে দিকনির্দেশনা আইনে রাখা হয়নি। সাধারণ তহবিল ব্যয়ের বিষয়ে ইউজিসিকে জানিয়ে অর্থ ব্যয়ের নিয়ম থাকলেও তা কোন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে তা উল্লেখ নেই।

- **বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি না থাকায় অর্থ সংক্রান্ত অস্বচ্ছতার ঝুঁকি সৃষ্টি:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একক কোনো নিয়ম অনুসরণ না করলেও প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। দেখা যায়, অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আয় ব্যয় সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। সাধারন তহবিল ব্যায়ের হিসেব সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকা ট্রাস্টিজ কর্তৃক উত্তোলন ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়

- **বিধিমালার অনুপস্থিতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকি সৃষ্টি:** টিউশন ফি ও অবকাঠামো সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধিমালার অনুপস্থিতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অধিকতর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। আইনে 'আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানদন্ডে' সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার্থী ফি কাঠামো, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের 'উপযুক্ত' বেতন কাঠামো নিয়ে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় এ খাতে শিক্ষা ব্যয় ও শিক্ষকদের বেতনভাতায় ব্যাপক তারতম্য লক্ষণীয়।

- **'পর্যাপ্ত অবকাঠামোর' ব্যাখ্যা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অপব্যবহার :** স্থায়ী ক্যাম্পাসের আয়তন ও অস্থায়ী ক্যাম্পাসের জায়গার পরিমাণ উল্লেখ থাকলেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কতটা কাছাকাছি অবস্থান করতে পারবে বা পারবেনা সেবিষয়ে নির্দেশনা নেই । একটি ভবনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- **আসনসংখ্যা ও অবকাঠামোর অনুপাত সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকা:** আইনে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন শিক্ষার্থী সংখ্যা বিষয়ে কোনো নির্দেশনা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসন বাড়িয়ে রাখে সনদ বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করে রাখে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হয়।

- **অনুমোদনের ক্ষেত্রে অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকায় রাজধানীতে সীমিত এলাকায় ব্যাপক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতি:** বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সম্পর্কে আইনে কোন বিষয় স্পষ্ট না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

রাজধানীকেন্দ্রিক স্থাপিত হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পারস্পরিক দুরত্ব ও ভৌগলিক অবস্থান খুব নিকটবর্তী হওয়ায় শিক্ষার পরিবেশ লংঘিত হচ্ছে। রাজধানীসহ ঢাকা অঞ্চলে মোট ৯৪টি সরকারি ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যা আঞ্চলিকভাবে বৈষম্যপূর্ণ ও সুষম শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্তরায়। উচ্চশিক্ষার ভৌগলিক ও আঞ্চলিক বিস্তরণের স্বার্থে যে সকল জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই সেসকল জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত না হলে রাজধানী ও বিভাগীয় শহরের উপর চাপ বাড়বে এবং আঞ্চলিক বৈষম্যপূর্ণ একটি পরিবেশ তৈরি হবে।

- **কারিকুলাম হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে অনুমোদন নেয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকা:** বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম প্রথমবার কমিশন কর্তৃক অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক হলেও পরবর্তীতে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয়না এবং বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিশ্চিত নয় বলে উল্লেখ করা হয় (ইউজিসি প্রতিবেদন, ২০১২)।

৩.২.২ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা

এই অধ্যায়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোর প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে।

- **এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনে বিলম্ব:** ২০১০ এর আইনে জাতীয়, স্বতন্ত্র, স্বাধীন এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কথা ২০১০ এর আইনে থাকলেও দীর্ঘ ৪ বছরেও এটি বাস্তবায়িত হয়নি। গঠনের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও দীর্ঘদিন যাবৎ এটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের জন্য খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা (২০১২ ইউজিসি প্রতিবেদন) দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের খসড়া তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তাদের মতামত নেয়া হলেও খসড়া চুড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত নেয়া হয়নি। এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণয়ন করার কাজ চলমান থাকলেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দাবী এটি সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণয়ন করা উচিত।

- **দেশীয় ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে পলিসিগত বৈষম্য:** বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুমতি নিয়ে পরিচালনা করার অনুমতি পেলেও দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য এটি হুমকি সৃষ্টি করবে। কারণ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় নাম শুনে বিদেশী ডিগ্রী পাওয়ার জন্যই অনেক শিক্ষার্থী সেখানে ভর্তি হবে। এছাড়া বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোন ধরণের ও মানের বিশ্ববিদ্যালয় এখানে হবে সেটির মান যাচাইয়ের কোনো মানদন্ড নেই। সরকার দেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ী ক্যাম্পাসের আইনত বাধ্যবাধকতা দিলেও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এধরণের বাধ্যবাধকতা করেনি। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আইন শিথিল করা হয়েছে। একদিকে সরকার দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে অন্যদিকে তারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার' খোলার অনুমতি দিচ্ছে। বিদেশি প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা পলিসি ও নীতিমালা কার্যত দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হুমকির মধ্যে ফেলবে।

- **ইউজিসির নিজস্ব আইনে পরিবর্তন না আনা ও পৃথক উচ্চ শিক্ষা কমিশনে না থাকা:** সরকারি প্রতিষ্ঠানের দেখভাল করার জন্য ইউজিসি গঠিত হলেও ৭৯টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় (১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ২৬ ধরণের কাজ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তদারকি করতে হচ্ছে। এজন্য ইউজিসির আইনি কাঠামোর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মধ্যে ইউজিসির ভূমিকার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে আইনগতভাবে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী করে যুগোপযোগী অর্থবহ সংস্থায় রূপান্তর করা জরুরি। ইউজিসি'র ভাবমূর্তি, স্বায়ত্তশাসন, মানমর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে একটি পূর্ণ স্বাধীন সংবিধিবদ্ধ 'উচ্চ শিক্ষা কমিশন (Higher Education Commission) রূপান্তরের জন্য এর রূপরেখাসহ একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও এটি কার্যকরে উদ্যোগ নেই। ইউজিসির নিজস্ব আইনে পরিবর্তন না আনা ও পৃথক উচ্চ শিক্ষা কমিশনে না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পর্যাপ্ত মনিটরিং ঘাটতি লক্ষনীয়। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় আসলে এটির কাজের ব্যাপকতা আরো বাড়বে।

- **মামলার দীর্ঘসূত্রতা, লঘু দন্ড ও কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না থাকায় অনিয়মতান্ত্রিক অনিয়ম ও দুর্নীতি:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চ আদালত থেকে স্টে অর্ডার নিয়ে এসে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে, অভিযোগুলোর আশু সমাধান হচ্ছে না এবং এক্ষেত্রে কার্যকর ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণে কর্তৃপক্ষের অনীহা কাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে সর্বোচ্চ অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং

১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হতে পারে- বলা হলেও বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোক্তারা এটিকে গুরুত্ব দেয় না।[২৯]

এই অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এবং এর প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

[২৯] ধারা লংঘন [৩(২):অনুমতি ব্যতীত স্থাপন, ৬ (১০): দেশের স্বাধীনতা ও আর্বভৌমত্ব জাতীয় স্বার্থেও জন্য এবং শিক্ষার্থীর জন্য ক্ষতিকর ক্ষতিকর বিবেচিত হলে, ১২: সাময়িক অনুমতি প্রাপ্তির পর সনদপত্রের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে, ১৩(২): যেস্থানে স্থাপনের অনুমতি নেই সেসব স্থানে স্থাপন করলে, ৩৫ (১): শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিকল্পনা অনুমোদিত না হলে, ৩৯: অনুমোদন ব্যতীত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ক্যাম্পাস স্থাপন এবং সাটিফিকেট প্রদান করা হলে, ৪৫(২): নিরীক্ষা করা না হলে এবং কমিশনে রিপোর্ট প্রদান না করলে, ৪৬ (২: পরিদর্শনের পর অবকাঠামো এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের নির্দেশ থাকলেও না করলে; ৩: কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা থাকলেও না দেয়া; ৬: বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক, প্রশাসনিক ও শৃক্ষলা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকার ও কমিশন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় তা মানতে বাধ্য না থাকলে), ৪৭ (পূর্বের আইনে যা থাকুক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক সনদপত্র গ্রহণ না করলে বর্তমান আইন অনুসারে সনদপত্র গ্রহণ না করলে)করলে অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হতে পারে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতিসমূহ এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজন এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও অংশীজনে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সম্পর্কে একটি ধারনা দেয়। উল্লেখ্য নির্বাচিত ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের অনিয়মের প্রকৃতি ও মাত্রা তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু একক কোনো প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা হয়নি।

৪.১ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

৪.১.১ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম

▪ **স্থায়ী সনদ গ্রহণ না করে অনিয়মঃ** সাময়িক অনুমোদন নিয়ে ৭ বছর পর (নবায়নসহ সর্বোচ্চ মোট ১২ বছর) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সনদ গ্রহণ করার নিয়ম থাকলেও সনদ গ্রহণ না করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২টি বিশ্ববিদ্যালয় এ সনদ গ্রহণ করেছে। ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৩২ টি বিশ্ববিদ্যালয় ১২ বছর এবং ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় ৭ বছর অতিক্রম করেছে। নির্বাচিত ২২টির মধ্যে মাত্র ১টি বিশ্ববিদ্যালয় এই সনদ গ্রহণ করেছে, ২১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী সনদ নেই।

▪ **নিজস্ব জমিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা না করে অনিয়মঃ** সীমিত সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা (২২টির মধ্যে মাত্র ৬টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা করছে)। সনদবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও শর্তাবলী লংঘন করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। উল্লেখ্য ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিতে ক্যাম্পাস রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পর সনদপত্র গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তা অনুসরণ করছে না, এতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সনদ প্রাপ্তির জন্য ঢাকায় অখন্ড, নিষ্কন্টক ১ একর জমি থাকার বিষয় উল্লেখ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার তুলনায় জমির স্বল্পতা থাকলেও সরকার অনুমোদন দিচ্ছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২০১২ সালের হিসেব অনুযায়ি, ৬০টির মধ্যে ৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় অবস্থিত অর্থাৎ সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ৯৪টি।

বক্স ১: চার কক্ষের বিশ্ববিদ্যালয়!

'মাত্র চারটি কক্ষ। দুটিতে ক্লাস রুম। একটি ক্লাসে লাল রঙের হাতলওয়ালা কয়েকটি চেয়ার; অপর ক্লাসে প্রাইমারী স্কুলের মত বেঞ্চ বসানো। একটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক বসেন; অন্যটিতে ছাত্র ভর্তি ও তথ্য প্রদানের কক্ষ এবং দাফতরিক কাজে ব্যবহৃত হতো। নগরীর উপশহরের একটি বাড়ির তিন তলায় মাত্র চারটি কক্ষ নিয়েই চলত আমেরিকা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে আকৃষ্ট করতে কক্ষগুলোতে লাগানো হয় আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ড্যান মজিনার সঙ্গে ওই আউটার ক্যাম্পাসের পরিচালক পরিচয়দানকারীর তোলা ছবি। আউটার ক্যাম্পাস উচ্ছেদ অভিযানে জব্দকৃত কম্পিউটারে বিদেশী অনেক অশ্লীল ভিডিও চিত্র রক্ষিত ছিল।

উৎসঃ সমকাল, ২৪ মে ২০১৪

▪ **সংবিধি তৈরী না করা বা করলেও অনুসরণ না করায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অনিয়মঃ** প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন সম্পর্কিত একটি নিজস্ব সংবিধি তৈরী করার বিধান থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে তারা সেটি অনুসরণ করেন না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবিধি থাকরেও তারা অনুসরণ করেন না এবং প্রয়োজনবোধে তারা নিজেদের মতো পরিবর্তন করেন। এক্ষেত্রে সংবিধি প্রণয়ন কর ইউজিসিতে প্রেরণ করলেও ইউজিসির বাধ্যতামূলক এখতিয়ার না থাকায় তারা সেটি সম্পর্কে কোনো ধরণের তদারকি করেনা।

▪ **ট্রাস্ট্রি বোর্ড দ্বারা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণঃ** নীতি নির্ধারণী ও অনুমোদন পর্যায়ে পর্যায়ে ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ট্রাস্ট্রি বোর্ড দ্বারা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ লক্ষ করা গেছে। ২২টির মধ্যে মাত্র ১টির ক্ষেত্রে বিওটি কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করেন না বলে জানান, ২টির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম হস্তক্ষেপ করা হয় এবং অন্য সবগুলোর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ পুরোমাত্রায় লক্ষণীয়। ক্ষেত্রবিশেষে উদ্যোক্তারা নিজেদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় সক্রিয় রাখেন এবং অন্যান্য কমিটি যেমন সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলকে নিষ্ক্রিয় করে রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটি যেমন অর্থ কমিটি, নিয়োগ কমিটিসহ অন্যান্য কমটিগুলোতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন এবং মনোনীত প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমেও কমিটির সদস্যদের আজ্ঞাবহ করে রাখেন।

▪ **অযৌক্তিকভাবে সভাসংখ্যা, সম্মানী বৃদ্ধিসহ অন্যান্য অনিয়ম:** বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের কোন ধরণের অর্থ নেয়ার নিয়ম না থাকলেও তারা অযৌক্তিকভাবে সভাসংখ্যা ও সম্মানী বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। একটি সভার জন্য সম্মানী বাবদ তারা ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা নিয়ে থাকেন। এছাড়া দেশের বাইরে সফরের আয়োজন করে সফরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে করা হয়েছে বলে চালানোর তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কার্যকর সভার পরিবর্তে কাগুজে সভা হয় (পরে স্বাক্ষর গ্রহণবাবদ সম্মানী প্রদান করা হয়)। তথ্যদাতাদের মতে, সিন্ডিকেটে দুজন সদস্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি কর্তৃক নির্ধারণ করা হলেও দেখা যায়, সভার চিঠি দেরি করে ইস্যু করা হয় যাতে তিনি উপস্থিত হতে না পারেন। ফলে ঢাকার বাইরে থাকা প্রতিনিধিরা অনেক সময় সভাগুলোতে উপস্থিত হতে পারেন না।

▪ **ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক বোর্ড গঠন করা হয় এবং বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব দাবি করে তারা একগ্রুপ আরেক গ্রুপের বিরুদ্ধে মামলা করেন (নির্বাচিত ২২টির মধ্যে ৫টির ক্ষেত্রে এ ধরণের দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। একাধিক উদ্যোক্তা থাকায় ট্রাস্টি বোর্ডে প্রাধান্য বিস্তারকারী গ্রুপের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, একটি বিশ্ববিদ্যালয় দুভাগ হয়ে দুজায়গায় ক্লাস নেয়া শুরু করে এবং আলাদা ক্যাম্পাস করে। গবেষণায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় চার ভাগে ভাগ হয়েও ক্যাম্পাস পরিচালনার তথ্য পাওয়া গেছে। পাশাপাশি একাধিক গ্রুপ নিজেদের ইচ্ছামত আউটার ক্যাম্পাসও পরিচালনা করার তথ্য পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভক্তিও লক্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় বিভক্ত না হলেও সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে ও প্রতিষ্ঠানে সুস্পষ্ট বিভক্তি লক্ষ করা যায়। এছাড়া বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব, ট্রাস্টিদের মধ্যে জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব, প্রতিষ্ঠাতা দাবী নিয়ে দ্বন্দ্বের অভিযোগ রয়েছে।

▪ **না জানিয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম বোর্ডে অন্তর্ভুক্তি ও ব্যবহার:** ট্রাস্টি বোর্ড গঠনে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যাক্তিদের নাম ব্যবহার করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এবং প্রভাব বিস্তার সহজ হয়। দেখা গেছে, এধরণের বোর্ড গঠনে না জানিয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম বোর্ডে অন্তর্ভুক্তি করা হয় এবং নাম ব্যবহার করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে একজন বৈধ ট্রাস্টি বোর্ড থাকার পরও আরেকটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়।

বক্স ২: মাননীয় মন্ত্রি ও এমপিকে না জানিয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি এবং একটি বৈধ ট্রাস্টি থাকার পরও সম্পূর্ণ অবৈধভাবে বোর্ড গঠন

একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য গঠিত দুটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ডীডের কপি কমিশনে পাওয়া যাওয়ার পর দেখা যায়, একটি বোর্ড গুলশানে এবং অন্যটি মিরপুরে গঠিত হয়েছে। দুটি বোর্ডে দুজন আলাদা চেয়ারম্যানের না ঘোষণা করা হয়েছে। মিরপুরে গঠিত বোর্ডে একজন মন্ত্রী, এমপিকে সদস্য হিসেবে দেখানো হয়েছে যদিও তারা এই বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সাথে সম্পৃক্ত নন। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়ে আসছিল যেখানে উল্লিখিত মন্ত্রী ও এমপি সদস্য হিসেবে রয়েছেন। তথাপি একটি বোর্ড থাকার পরও সম্পূর্ণ অবৈধভাবে মিরপুর সাব রেজেস্ট্রি অফিসে মন্ত্রী ও এমপিকে সদস্য করে বোর্ড গঠন করা হয়েছে যেখানে তাদের মতামত বা অনুমতি নেয়া হয়নি।

উৎস: মুখ্য তথ্যদাতা ও প্রাপ্ত ছাপানো ডকুমেন্টের ভিত্তিতে

▪ **শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য:** ট্রাস্টি বোর্ডে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নন এমন ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য। তথ্যদাতাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড পরিবারের সদস্য, বন্ধ-বান্ধব, পরিচিত মহল নিয়ে গঠিত হচ্ছে এবং দেখা গেছে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে ৫-৬ জন একই পরিবারের সদস্য। এতে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বক্স ৩: 'ই' বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারতন্ত্রে বন্দি

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ (সংশোধিত) এর ৬ (১) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হবে ন্যূনতম ৯ থেকে সর্বোচ্চ ২১ জন সদস্য নিয়ে। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে সদস্যমাত্র ৬ জন। আবার তাদের মধ্যে একজন পদত্যগ করেছেন। দুইজন থাকে দেশের বাইরে। তাই কাগজে কলমে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছয়জন হলেও কার্যত: বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও তার বোন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় অধ্যাপকের সন্তান। ট্রাস্টি বোর্ডের এই দুই প্রভাবশালী সদস্য উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে কর্মচারী নিয়োগ সব কিছুরই সিদ্ধান্তদাতা। তাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের বিভিন্ন অভিযোগ তুলে টানা ১৭ দিন ধরে আন্দোলন করছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-চিকিৎসক-কর্মকর্তা-কর্মচারী-শিক্ষার্থী। এতে অনির্দিষ্টকালের জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। অনিয়শ্চয়তার মুখে পড়েছে প্রতিষ্ঠানের তিন হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত। উৎকণ্ঠায় রয়েছে প্রায় ১২শ' বিদেশী শিক্ষার্থীও।

উৎস: ০৮ জুন, ২০১৪, দৈনিক সমকাল

▪ **দীর্ঘদিন অস্থায়ী/ভারপ্রাপ্ত ভিসি, প্রভিসি, ট্রেজারার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দীর্ঘদিন অস্থায়ী/ভারপ্রাপ্ত ভিসি, প্রভিসি, ট্রেজারার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে। দেখা গেছে, ৭৯টি মধ্যে ৫২জন ভিসি আছে আর ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে ভারপ্রাপ্ত দিয়ে। ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬১টি প্রভিসি দিয়ে চলছে। ট্রেজারার একটি গুরুত্ব পদ হলেও ৪৯ টি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারার দিয়ে।

▪ **শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সেলের অনুপস্থিতি:** শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সেলের অনুপস্থিতি ও তার বিবরণী বার্ষিক প্রতিবেদনে না থাকায় শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে শিক্ষার মান সম্পর্কে এক ধরণের অস্পষ্টতা তৈরি হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

▪ **স্টে অর্ডার নেবার পর ইউজিসিতে রিপোর্ট না করে কর্মকান্ড পরিচালনা:** সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ নেওয়ার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্টে অর্ডার বা স্থগিতাদেশ নেবার পর পরিচালনা করে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসিতে রিপোর্ট না করে কর্মকান্ড পরিচালনা করে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, অবৈধ ক্যাম্পাস ও কোর্স পরিচালনা করার কারণে পদক্ষেপ নেয়া হলে হাইকোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ তারা নিয়ে থাকে। এধরণের ঘটনায় ইউজিসির বিরুদ্ধেও অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মামলা করে মামলা জট তৈরি করে এবং মামলা নিরসণে এক ধরণের দীর্ঘসূত্রীতা তৈরি হয়।

▪ **প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বেতন ও সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে আকৃষ্ট করে ট্রাস্টি বোর্ডের নতুন সদস্য, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অবসরপ্রাপ্ত আমলা/প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি:** একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ভিসি হিসেবে পূর্ব নির্বাচন করার তথ্য পাওয়া গেছে। অপর একটিতে বড় ধরনের দুর্নীতির পর রাষ্ট্রীয় শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তির সন্তানকে চাকুরী প্রদান। জানা যায়, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ভুয়া সাটিফিকেট প্রদানের বিষয়ে সমঝোতা করার জন্য তাকে নিয়োগ প্রদান করেন।

▪ **ভিসি, প্রভিসি, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম:** ভিসি, প্রভিসি, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম লক্ষ করা যায়। ভিসি, প্রভিসি নিয়োগের জন্য তিনজনের নাম প্রদান করার কথা থাকলেও দেখা যায়, তিনজনই থাকেন ট্রাস্ট্রি বোর্ডের পছন্দনীয় ব্যক্তি। পূর্ণকালীন শিক্ষক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশি খন্ডকালীন শিক্ষক হতে পারবে না বলা হলেও খন্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তঅধ্যাপক এবং পূর্ণকালীন শিক্ষকদের নাম কাগজে কলমে থাকলেও বাস্তবে পাওয়া যায় না। ক্ষেত্রবিশেষে, অনেক অধ্যাপক ও শিক্ষক জানেনই না তাদের নাম এবং সিভি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করছে। তথ্যদাতাদের মতে, অধ্যাপকের চেয়ে প্রভাষক দিয়েই মূলত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কাগজে-কলমে ঠিক থাকলেও বাস্তবে খন্ডকালীন শিক্ষকের হার বেশী থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

▪ **অবৈধভাবে বিভিন্ন শিক্ষকের নাম ব্যবহার:** বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নত দেখানোর জন্য অবৈধভাবে বিভিন্ন শিক্ষকের নাম ব্যবহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকদের না জানিয়ে তাদের সিভি ব্যবহার করা হয়। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রদান করে সিভি সংগ্রহ করে। তারপর ভালো সিভিগুলো নিয়ে শিক্ষক হিসেবে তারা নিয়োজিত আছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে জানা। দেখা যায়, একই ব্যক্তির সিভি ৫-৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিবন্ধিত আছে। কার্যতঃ তারা (সেইসব ব্যক্তিরা যারা সিভি দিয়েছেন) জানেনইনা তাদের সিভি ব্যবহৃত হচ্ছে। কমিশনের সক্ষমতার অভাবে এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভি যাচাই করা সম্ভব হয় না।

▪ **বাস্তবে শিক্ষকের উপস্থিতি না থাকা:** কাগজে কলমে শিক্ষকের কোটা পূরণ দেখালেও বাস্তবে শিক্ষকের উপস্থিতি থাকে। শুধু শিক্ষকদের সিভি সংরক্ষিত রাখা হয়। ইউজিসির মতে, 'শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুসরণ করেনা।' ক্ষেত্রবিশেষে কমিশন মূল (স্থায়ী) প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে দুই'র অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা (২টির অধিক করার নিয়ম নেই) করেন। অনেকসময় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে ছাড়পত্রের কপি জমা না দেয়া না।

▪ **শিক্ষকদের পারফরমেন্স মূল্যায়নে অনিয়ম:** যোগ্যতার তুলনায় নিম্ন বা অতি মূল্যায়ন করা, কম যোগ্য ব্যক্তিকে বিভাগীয় প্রধান করা উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে পর্যাপ্ত গবেষণা প্রতিবেদন ও আর্টিকেল না থাকা সত্ত্বেও অনেকে সিনিয়র পদে উন্নীত হয়ে যাওয়া ঘটনা ঘটছে। রেফারেন্সের মাধ্যমে বা প্রভাবশালী হলে অতি দ্রুত সিনিয়র পদে উন্নীত করা হয়। তথ্যদাতাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা না থেকেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। দেখা গেছে, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা, সরকারী আমলারাও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন।

▪ **ভুয়া পিএইচডি ব্যবহার:** একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে একজনকে নিয়োগ প্রদান করার তথ্য পাওয়া গেছে যিনি তার নামের সাথে ভুয়া পিএইচডি ব্যবহার করতেন। বিষয়টি চিহ্নিত হওয়ার পর তাকে ভিসি থেকে প্রভিসি করা হলেও চাকুরীতে

তার বহাল রাখা হয়েছে। ভুয়া পিএইচডি ব্যবহার করে ওয়েবসাইটে নাম প্রকাশ করছেন এধরণের একজন ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান রয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

▪ **শর্তপূরণ না করা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান:** শর্তপূরণ না করা ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। এধরণের নিয়োগে ইউজিসি কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে না। সবগুলো প্রথম শ্রেণী ও অভিজ্ঞতা থাকার বিষয় উল্লেখ থাকলেও কোনো কোনো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম না মেনে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি করছে। অনেক ক্ষেত্রে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করার শিক্ষার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য অতিরিক্ত নম্বর প্রদান করার তথ্য পাওয়া গেছে।

বক্স ৪: শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালার লংঘন

- *'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা রয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে কমিশন কর্তৃক শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এর ব্যতয় ঘটেছে বলে কমিশন মনে করে।'*
- *নিয়মানুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য ও অভিজ্ঞ পূর্ণকালীন ও খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ না করে অধিক সংখ্যক সবে মাত্র পাশ করা জুনিয়র শিক্ষক নিয়োগ করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল।*

উৎস: ২৭ মার্চ ২০১৪, ইউজিসি থেকে প্রাপ্ত লিখিত বক্তব্যের ভিত্তিতে

▪ **ব্যস্ত রাস্তা, গার্মেন্টস, বাণিজ্যিক ভবন ও অপরিসর রাস্তার পাশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা:** বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সরকারীভাবে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও দেখা যায়, ব্যস্ত রাস্তা, গার্মেন্টস, বাণিজ্যিক ভবন ও অপরিসর রাস্তার পাশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। ঢাকাতে এ সমস্যা প্রকট। কয়েকটি এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শপিং কমপ্লেক্সের ভেতরে, সরু গুলির ভেতরেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে।

বক্স ৫: ও ইউজিসির নীতিগত সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা

'শিক্ষার পরিবেশ সুরক্ষার নিমিত্ত সরকার ও ইউজিসির নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। যেমন: ভিআইপি সড়কসহ ব্যস্ততম এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পাশে ও আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস স্থাপন না করার জন্য ২০০৮ সালে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে।'

উৎস: ২৭ মার্চ ২০১৪, ইউজিসি থেকে প্রাপ্ত লিখিত বক্তব্যের ভিত্তিতে

▪ **লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই ও অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি তৈরি না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়/অনুষদ খোলা:** কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পর্যাপ্ত অবকাঠামো থাকার পরও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষার্থীরা প্রযোজনীয় জ্ঞান অর্জ না করেই সার্টিফিকেট অর্জন করছে।

বক্স ৬: অবকাঠামো না থাকা

'কোন কোন বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীতে পড়ার সুযোগ নেই। অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরির অভাবে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার সাইন্স, ফার্মেসী, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োক্যামেস্টি, ফলিত বিদ্যা, ইলেক্ট্রনিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ক পর্যাপ্ত ব্যবহারিক শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উৎস: ২৭ মার্চ ২০১৪, ইউজিসি থেকে প্রাপ্ত লিখিত বক্তব্যের ভিত্তিতে

- **বেতন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত কাঠামো না থাকা:** শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকুরীর প্রবিধানমালা প্রস্তুত করে মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করা হলেও এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের অনিয়ম লক্ষণীয়। বিজ্ঞাপনের তুলনায় কম বেতন প্রস্তাব করা, কাগজে কলমে বেশি দেখিয়ে বাস্তবে কম দেওয়া, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা রেফারেন্সের ভিত্তিতে বেতনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

- **ছুটি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা না থাকা:** সংবিধি না থাকার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষা ছুটি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেয়া না। পূর্ণকালীণ শিক্ষকদের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ওয়ার্কলোড অনেক বেশি থাকায় গবেষণা কাজ বা পিএইচডির জন্য শিক্ষকরা ছুটি পান না, এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনীহা কাজ করে।

- **নিয়মানুযায়ী গবেষণা প্রকল্প খাতে অর্থ বরাদ্দ না রাখা:** অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী গবেষণা প্রকল্প খাতে অর্থ বরাদ্দ না রাখার প্রবণতা লক্ষণীয়। নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ টির মধ্যে ১৩টিতে গবেষণা প্রকল্প না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

- **যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন না করা:** সরকারি আদেশে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন করা হলেও, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেলের জন্য নির্ধারিত অফিস কক্ষ নেই এবং সাধারণ শিক্ষার্থী এই সেলের বিষয়ে কিছুই জানে না।

- **মত বিনিময় সভা না করা:** আইনে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে বছরে একবার মত বিনিময় সভা করা ও তার ওপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে এ ধরণের উদ্যোগ না থাকা। শিক্ষকদের মতামত ও অভিযোগ প্রকাশ করার জন্য কোন প্ল্যাটফর্ম না থাকায় তারা মতামত প্রদান করতে পারে না।

- **ওয়েবসাইট হালনাগাদ না থাকা:** বেসরকারীবিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ওয়েবসাইটে (শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা দেয়া আছে) দেওয়া নেই, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওয়েবসাইটেও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সব তথ্য (শিক্ষকদের তালিকা, শিক্ষার্থীর তালিকা, বিভিন্ন ধরণের ফিস) পাওয়া যায়নি। ফলে এটি সাধারণ অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের উপযোগী নয়। এছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান কেমন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট উপযোগি, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন কোন প্রতিনিধি সম্পৃক্ত আছেন, অডিট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। এছাড়া শিক্ষাসেবা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতিমালা ওয়েবসাইটে না থাকা উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়নি।

বক্স ৭: একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমসাময়িক চিত্র

বিশ্ববিদ্যালয়টির দুটো ক্যাম্পাস। একটা উত্তরা আরেকটি মতিঝিলে। উত্তরার ক্যাম্পাসটি মূল ক্যাম্পাস। নিজস্ব কোনো ভবন নাই। উত্তরায় মালিকের বাসা ৪তলা। তার দুই তলা নিয়ে প্রশাসনিক ভবন। শিক্ষার মান, শিক্ষকের মান এবং শিক্ষার্থীর মান নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও মান সম্মান নিয়েও তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়টি চলছে সম্পূর্ণ মালিকের ইচ্ছায়। এখানে মালিকই ভিসি। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ১৬ বছর ধরে তিনিই ভিসি। এছাড়া তার ছেলের জন্য আরেকটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে সাবাক, SAVC (Special Assistant to VC), মাত্র ৩০ বছর বয়সে সেই একটি বিভাগের ডিপার্টমেন্টাল হেড এবং অনুষদের ডীন। ভিসির অসুস্থতার কারণে তার ছেলেই পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি। প্রভিসি, রেজিস্টারের কার্যত কোনো ক্ষমতাই নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের গবেষণার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি ফুল টাইম এবং সিনিয়র শিক্ষকদেরও এধরণের কোন সুযোগ নেই। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে চায় না, তারা যত কম পড়াশোনা করে সার্টিফিকেট পাওয়া যায় ততই খুশি। কোনো ধরণের গবেষণা বা ক্লাস করার প্রয়োজনই বোধ করেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিন বন্ধ রেখে সব দিনেই ক্লাস হওয়ার কথা, কিন্তু এখানে উল্টো ক্লাস হয় শুধু শুক্রবার। যারা সার্ভিস করেন তারা দুর দুরান্ত থেকে এসে শুধু শুক্রবার ক্লাস করলেও নিয়মিত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও একই রকম চিত্র লক্ষণীয়। সত্যিকার অর্থে শিক্ষার্থীরা যেভাবে চান সেভাবেই হয়। তাই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়টির পিয়ন-দারোয়ানও সেখানকার ডিগ্রী পেয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের কোনো ক্ষমতা নেই। শিক্ষকরা খুব লো-পেইড। লেকচাররা সাধারণত: ৫০০০-২০০০০ টাকা বেতন পান। শিক্ষকদের বসার ব্যাবস্থা ভালো না, ফটোকপি নষ্ট, কাগজ নেই।

বিএ কোর্সগুলো যারা করে সেসব শ্রেণীকক্ষে কিছু শিক্ষার্থী পাওয়া গেলেও অন্য শ্রেণীতে শিক্ষার্থী থাকে না। ক্লাসে শিক্ষার্থীরা মারামারি করে, চেয়ার টেবিল ভাঙ্গে। প্রায়ই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন বন্ধ থাকে। ক্যাম্পাসে সারাক্ষণ নিরাপত্তা কর্মী, অনেক পুলিশও থাকে। তবে শিক্ষার্থী প্রচুর সংখ্যক। কারণ ক্লাস করতে হয় না। সবচেয়ে বেশী থাকে কম্পিউটার সায়েন্স এবং বিবিএতে। বিভিন্ন জেলা শহরের শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আসে। জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ না থাকলেও সবাইকেই ভর্তি করা হয়। পরীক্ষার হলে প্রচুর নকল হয়। শিক্ষার্থীরা বুক খুলে পরীক্ষা দেয়। শিক্ষকরা কিছু বলতে আসলে শিক্ষার্থীরা মারতে আসে। পরীক্ষায় সবাইকে পাশ করিয়ে দেয়া হয়। ডিপার্টমেন্ট হেড যেভাবে চান সেভাবেই হয়।

মালিকেরা বিভিন্নভাবে অর্থ নিয়ে থাকেন। নিয়ম নীতির কোনো তোয়াক্কা করেন না। খাতাকলমে অনেকগুলো মিটিং করার কথা বললেও কোনো মিটিংই হয় না। এসব মিটিং বাবদ বিভিন্ন অর্থ নেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার কোনো পরিবেশই নেই। অল্প কিছু শিক্ষার্থীর শেখার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ নেই। 'অনেকটা টাকা দাও সার্টিফিকেট নাও' এধরণের সিস্টেম। লাইব্রেরী থাকলেও সেটা কাউকেই ব্যবহার করতে দেখা যায় না। এই সরকার আসার আগে শিক্ষকরা সবাই ইসলামী মাইন্ডেড ছিলো এবং পাঞ্জাবী পায়জামা, স্কার্ফ পড়তো কিন্তু এই সরকার আসার পর তারা সবাই শার্ট-প্যান্ট পড়া শুরু করে দিয়েছে।

উৎস: মুখ্য তথ্যদাতা, লেকচারার

৪.২.২ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি

- **অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা:** অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা (ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী ১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০টি পর্যন্ত অবৈধ ক্যাম্পাস খোলার দৃষ্টান্ত রয়েছে- ইউনিয়ন পর্যায়েও; তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা নিজেই দাবী করেন যে তাদের শাখা ক্যাম্পাসের সংখ্যা কয়েক শত)। সরকারি আদেশে কিছু আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ

ঘোষণা করা হলেও, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ভর্তি ও পরামর্শ কেন্দ্র'-র নামে আউটার ক্যাম্পাস চালু রাখা হয়েছে। অনুমোদিত ক্যাম্পাসের বাইরে অনুনোমোদিত অনেক ক্যাম্পাস রয়েছে যারা পড়াশোনার পরিবর্তে শুধু সার্টিফিকেট বিক্রি করে।

- **ক্লাস না করিয়ে, পরীক্ষা না নিয়ে ও ব্যবহারিক ক্লাস না নিয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান:** ক্লাস না করিয়ে, পরীক্ষা না নিয়ে ও ব্যবহারিক ক্লাস না নিয়ে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান করছে কযেকটি বিশ্ববিদ্যালয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০০ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ৩ লক্ষ করে টাকার বিনিময়ে সনদ প্রদান করার নজির স্থাপন করেছে। সান্ধ্যকালীন ও এক্সিকিউটিভ কোর্সগুলোর ক্ষেত্রে ক্লাস না করিয়েও পরীক্ষা গ্রহণ করার অভিযোগ রয়েছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বই দেখে লেখা, অল্প সংখ্যক প্রশ্নের সাজেশনসহ পরীক্ষায় পাশ করানোর নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে।

- **ভর্তির সময়ে উল্লেখিত টিউশন ফি'র চেয়ে অধিক আদায়, পরবর্তীতে শিক্ষার্থীকে অবহিত না করে বৃদ্ধি করা:** ভর্তির সময়ে উল্লেখিত টিউশন ফি'র চেয়ে অধিক আদায়, পরবর্তীতে শিক্ষার্থীকে অবহিত না করে বৃদ্ধি করার অভিযোগ রয়েছে। সেমিস্টার ফি, এ্যাসাইনমেন্ট ফি, কোর্স রিটেক ফি, ফি অনাদায়ে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ আদায় করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নের উৎস হলেও এটি অনিয়ন্ত্রিতভাবে নেয়া হচ্ছে। শিক্ষার মান, সার্টিফিকেট মূল্য ইত্যাদি কোনা ধরণের মানদন্ড নেই মন্ত্রণালয়ের এবং ইউজিসির। শিক্ষার্থী ফি নেয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার মানদন্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফি নেয়ার কথা থাকলেও কোন গাইউলাইনও দেয়া হয়নি। ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং শিক্ষকদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি প্রদান করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চহারে ফি নিয়ে থাকে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকেই প্রতিবছর টিউশন ফি ও ভর্তি ফি সহ অন্যান্য ফি বৃদ্ধি করে। শিক্ষার্থী ফি কাঠামো মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে পার্থক্য বিদ্যমান।

- **ইউজিসিকে না জানিয়ে তহবিলের টাকা ট্রাস্টি কর্তৃক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার:** ইউজিসিকে না জানিয়ে তহবিলের টাকা ট্রাস্টি কর্তৃক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখান থেকে নেয়া অর্থ অন্য ব্যবসায় খাটানো হচ্ছে। বোর্ড অব ট্রাস্টি কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা এবং ট্রেজারার এর যৌথ স্বাক্ষরে সাধারণ তহবিল পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বোর্ড অব ট্রাস্টি পছন্দনীয় ব্যক্তি সাধারন তহবিল নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অবহিতক্রমে সাধারণ তহবিলের অর্থ বোর্ড অব ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ করা যাবে। তবে দেখা যায় , বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় মালিকপক্ষ নিতে না পারলেও হস্তক্ষেপ লক্ষণীয় (বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে জমি কেনার আধিক্য, মালিকরা জমি কেনার নামে অর্থ আত্মসাৎ, অবকাঠামো উন্নয়ন, ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরী উন্নয়ন, কম্পিউটার প্রদান ইত্যাদি)।

- **ভূয়া রশিদ প্রদান:** বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য সংরক্ষিত তহবিলের জন্য ৩ কোটি টাকা প্রদান করতে হয়। দেখা গেছে, ভূয়া রশিদ প্রদান কওে বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে।

- **কোর্স কারিকুলাম পড়ানো, বিভাগ খোলা ও শিক্ষার্থী ভর্তি:** ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া কোর্স কারিকুলাম পড়ানো, বিভাগ খোলা ও শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে এবং অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অনুমোদন গ্রহণ করা হচ্ছে।

- **ভিসি, প্রভিসি, ট্রেজারার ও শিক্ষকসহ অন্যান্য নিয়োগে প্রভাব, অর্থ লেনদেন, স্বজনপ্রীতি:** বিশ্ববিদ্যালয়র বিভিন্ন ধরণের নিয়োগে অর্থ লেনদেন, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। এ ধরণের নিয়োগের মধ্যে ভিসি, প্রভিসি, ট্রেজারার ও শিক্ষকসহ অন্যান্য নিয়োগে প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

- **সদস্যদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নিজস্ব ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবহার:** কম্পিউটার, প্রকাশনা. নির্মাণ ও এসি ব্যবসা (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তথ্য অনুসারে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের বেশিরভাগ সদস্য ব্যবসায়ী। ব্যবসায়িক কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ী ও জনবল ব্যবহার। সরকারি নির্দেশনা না মেনে নিবন্ধনের নথিতে অতিরিক্ত দাম দেখিয়ে জমি ক্রয়, অবৈধভাবে অতিরিক্ত জমি ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

- **একই ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করানো ও সঠিক চিত্র প্রতিফলন না করা:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের যোগসাজশে সীমিত আকারে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বাৎসরিক অডিট করার নিয়ম রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত বহিঃনিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহের (সিএ ফার্ম) মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনটি ফার্মের নাম উল্লেখ করা হলেও দেখা যায়, একই ফার্মের মাধ্যমে প্রতিবছর অডিট পরিচালিত হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একই ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করানোর কারণে সঠিক চিত্রের প্রতিফলন হয় না। সমঝোতার মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

▪ **অনিয়ম ও দুর্নীতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সহজে বাস্তবায়ন:** ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার এবং সিন্ডিকেট ও গুরুত্বপূর্ণ কমিটির মনোনীত সদস্য ইত্যাদি পছন্দনীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত সহজে বাস্তবায়ন হয়। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি থেকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে মালিকের একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ করা যায়। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিগুলোতে মালিকের পরিবার এবং পছন্দনীয় লোকজনের আধিক্য লক্ষনীয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোক্তা ছাড়া অন্য কারো অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের সুযোগ না থাকা; বোর্ড অব ট্রাস্টিতে ভিসি সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করে তবে ভিসি উদ্যোক্তাদের পছন্দীয় ব্যক্তি হয়ে থাকেন। ন্যায়সংগত না হলেও বোর্ড অব ট্রাস্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন হয়। বোর্ড অব ট্রাস্টিতে সরকারি প্রতিনিধি না থাকায় ও দুজন শিক্ষাবিদ প্রতিনিধি সিন্ডিকেটে থাকলেও সিদ্ধান্ত প্রদানে তাদের সুযোগ কম।

▪ **সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রাখা:** বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যাহত রাখে। তারা বিভিন্ন অভিযোগ সমাধানে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতা নেয় এবং সমস্যা সমাধান না করে অনিয়মের মাধ্যমে সমঝোতা করে।

বক্স ৮: নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদনপত্র জমা, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একাধিক মন্ত্রীর সুপারিশ

২০১২ সালের তথ্য অনুযায়ি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৯৩টি। এগুলোর মধ্যে ৭৫টি সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ইউজিসি ইতোমধ্যে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে মন্ত্রণালয়ে। অধিকাংশের আবেদনকারীই হলেন প্রভাবশালী এমপি, সরকার দলীয় ও মহাজোটের শরীক নেতা, ব্যবসায়ী, সাবেক আমলা, সরকার পন্থী শিক্ষক নেতা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি। আবেদন কারীদের মধ্যে এমন চারজন আছেন যারা সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির নিকট আত্মীয় এবং শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন রয়েছে।

উৎস: মুখ্য তথ্যদাতা

▪ **গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ দেখিয়ে আত্মসাৎ:** বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা উদ্যোগের অভাব ও অনীহা লক্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা সুবিধা কম প্রদান করে কারণ এতে শিক্ষকদের অধিক ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। বাৎসরিক বাজেটের ব্যয়খাতে গবেষণার জন্য বরাদ্দপূর্বক ব্যয় করার কথা থাকলেও ব্যয় করা হয়না। ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়কে এখাতে কোনো ব্যয় করতেই দেখা যায়নি (৫টি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত)। এক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষক ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু গবেষণা করলে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলে চালানো হয়। এছাড়া শিক্ষকরা বিভিন্ন সভা সমিতি বা কনফারেন্সে গেলে সেগুলোও ব্যয় গবেষণা ব্যয় বলে দেখানো হয়। শিক্ষকদের ব্যক্তি উদ্যোগে যাওয়া সেমিনার পেপার, জার্নালে লেখা ও শিক্ষার্থীদের মাস্টার্সের থিসিস পেপারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলে চালানো - গবেষণা খাতে অর্থ বরাদ্দ দেখিয়ে আত্মসাতের কথা জানা যায়।

৫.২.১ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি

শিক্ষকরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নানাভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে যেমন, ইউজিসির নির্দেশনা অনুসারে ২টির অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করা নিষিদ্ধ থাকলেও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পৃক্ত থাকা; পরীক্ষার নির্ধারিত প্রশ্ন পরীক্ষার পূর্বে বলে দেয়া ও সে অনুসারে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান; পাঠদান না করে শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রদানে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও অর্থ গ্রহণ; যৌন হয়রানি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি (শৃংখলা কমিটি ও বিওটি কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ না থাকা ও সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়গুলো বিরাজমান রাখা); শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষকদের উপঢৌকন ও নগদ অর্থ গ্রহণ করে পাশ করিয়ে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সময় প্রদান করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা কম সময় প্রদান করার অভিযোগ রয়েছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কত সময় বা কি পরিমাণ দায়িত্ব বহন করতে পারেন সেই বিষয়ে কেনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই।

শিক্ষার্থীদের অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে পাঠ গ্রহণ না করে/ পরীক্ষা প্রদান না করে সার্টিফিকেট প্রাপ্তির বিষয় গোপন রাখা (বিশেষ করে চাকুরী স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ব্যবহার), শিক্ষকদের নম্বর বাড়িয়ে দেয়া বা পাশ করানোর জন্য চাপ প্রয়োগ, শিক্ষকদের অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুতির হুমকী ও হয়রানি (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগের মাধ্যমে), শ্রেণীকক্ষ, টেবিল চেয়ার ভাংচুর ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত, ব্যক্তিগত টাকা ব্যয় করে পড়ছে তাই পাশ করিয়ে দিতেই হবে এ ধরণের মানসিকতা প্রদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ ও পরীক্ষা প্রদান করতে হবে না জেনে ভর্তি হওয়া ও সার্টিফিকেট ক্রয় উল্লেখযোগ্য।

৪.২.৩ অন্যান্য পর্যবেক্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবহন সুবিধা নেই, কমনরুম সুবিধা অপ্রতুল এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আলাদা কমনরুম নেই, শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাফেটেরিয়া/ কেন্টিন সুবিধা এবং ডাক্তার/ প্রাথমিক চিকিৎসা

সুবিধা নেই, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরিসর অর্পযাপ্ত ল্যাব সুবিধা, লাইব্রেরী থাকলেও অপর্যাপ্ত বই, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস/ ইউনিটগুলোর ভৌত সুযোগ-সুবিধা নিম্নমানের। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়ভেদে টিউশন ফি'র ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয় যেমন, বিবিএ জন্য সর্বনিম্ন ২,৫০,০০০, সর্বোচ্চ ৫,৫০,০০০ (পার্থক্য ৩০০০০০); সিএসই সর্বনিম্ন ২,৫০,০০০ এবং সর্বোচ্চ ৬,৩০,০০০ (পার্থক্য ৩,৮০,০০০); এমবিএ সর্বনিম্ন ৭৫,০০০; সর্বোচ্চ ৩,৩০,০০০, (পার্থক্য ২,৫৫,০০০)। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী প্রতি মাথাপিছু ব্যয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন ৯,৩৫৮ এবং সর্বোচ্চ ৫৪,৩৬০৯, (পার্থক্য ৫,৩৪,২৫১)।

বক্স ৯: 'ভ' বিশ্ববিদ্যালয় চিত্র

২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। মোট ৩টি ইউনিট রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির। সবগুলোই পান্থথে এবং কাছাকাছি। প্রথম ইউনিটে বারেক ম্যানশনে বিবিএ ক্যাম্পাস ৫৮/১১/এ ঠিকানায়। এটা একটা কমার্শিয়াল বিল্ডিং এর ৩য় তলা থেকে ৮ম তলা পর্যন্ত। নীচের তিন তলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোরসহ) ফার্নিচারের দোকান। লিফট আছে। দ্বিতীয় ইউনিটটি প্রশাসনিক ও ভর্তি অফিস। একটা মাত্র ফ্লোরের ৫০০ স্কয়ারফিট জায়গা নিয়ে অত্যন্ত সুসজ্জিত অফিস। এর পাশের গলিতে বিশ্ববিদ্যালযটির তৃতীয় ইউনিট। তৃতীয় ইউনিট ২টি বিল্ডিং নিয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৫০০এর মত। শিক্ষক সংখ্যা ৭০-৮০এর মত। এর মধ্যে ফুলটাইম ৩০-৩৫ জনের মত। নতুন অবকাঠামো এখনও নির্মান শুরু হয়নি। তবে, ভর্তি অফিসে নতুন অবকাঠামোর ডিজাইন ত্রিমাত্রিক মডেল দৃশ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে আইডি কার্ড ছাড়া ঢোকা যায় না, শ্রেণীকক্ষে হালকা ডেস্ক চেয়ার, হোয়াইট বোর্ড রয়েছে। সব রুমে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর নেই; সব রুম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিতও নয়। এখানকার শিক্ষকগণ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের। কয়েকজন শিক্ষক এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষার্থী যারা পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। **পরিদর্শন: ২৯ আগস্ট, ২০১২**

প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসের ডিজাইন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের রাস্তা

বক্স ১০: 'এ' বিশ্ববিদ্যালয় চিত্র

৩০ শে আগস্ট সকালে 'এ ইউনিভার্সিটি' পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশপথে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা ছিল। সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার সিট ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষা কক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রবেশ করাতে চাওয়া এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তা বাধা দেওয়ার কারণে এ অস্থিরতা ও বিশৃক্ষলা সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থী ও কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, বিগত কয়েক মাস ধরেই উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা থাকে। এর কারণ হিসেবে নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উত্তেজনার প্রেক্ষিতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায় 'এ বিশ্ববিদ্যালয়ে' বর্তমানে পড়ছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২/১৩ হাজারের মত। গুণগত মান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কয়েকজন একটু হেসে উত্তর দিয়েছিল 'ভালো'। ল্যাব নিয়মিত হয় কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন 'নিয়মিত হয় আর কি!'। ভর্তি হতে আসা কয়েকজন (ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট থেকে) শিক্ষার্থীক প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন তারা 'এ' ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছে? তারা জানিয়েছে- 'এখানে খরচ অনেক কম, ক্লাস করতে হয় না'। একাডেমিক ভবন একটাই এবং ৬ তলা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন ভিসির বাসার নিচে অবস্থিত। এই ৬ তলা বিল্ডিংয়ের ছোট্ট পরিসরে কিভাবে এত ছাত্র ক্লাস করে সেটি একটি প্রশ্ন। কার মাধ্যমে তারা এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জেনেছে তা জানতে চাইলে তারা তাদের আত্মীয় বা এলাকার পরিচিত ও প্রতিবেশিদের কথা উল্লেখ করেছে।

পরিদর্শন: ৩০ আগস্ট, ২০১২

বক্স ১১: 'প' বিশ্ববিদ্যালয় চিত্র

পরিদর্শন: ২৯ আগস্ট, ২০১২

মিরপুর-১ গোলচক্কর এর কাছেই একটি ৬ তলা ভবনের পুরোটা জুড়ে 'প' ইউনিভার্সিটি। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সামনেই ব্যস্ত সড়ক, ডানপাশেই একটি বৃহৎ গার্মেন্টস। ভবনের নিচ তলায় ভর্তি অফিস, তথ্য বুথ, পে-বুথ, ক্যন্টিন ও বেশ খানিকটা উন্মুক্ত জায়গা রয়েছে। পরিদর্শনকালে উক্ত উন্মুক্ত জায়গায় একটি গাড়ি পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেছে। এছাড়াও অনেক শিক্ষার্থীরা উক্ত উন্মুক্ত স্থানে বসে ও দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। ভর্তি অফিস লাগোয়া সিড়ি দিয়ে ৩ তলা পর্যন্ত যাওয়া যায়। পরিদর্শন কালে প্রতি তলায়ই উন্মুক্ত স্থানে একটি টেবিল-চেয়ার রয়েছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ রয়েছে সার্বিক পরিস্থিতি মনিটর করার জন্য। ২য় তলায় প্রক্টরের অফিস, লাইব্রেরী, পদার্থ ল্যাব ইত্যাদি রয়েছে। ৩য় তলায় কম্পিউটার ল্যাব, গবেষণা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত কক্ষ, ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ইত্যাদি রয়েছে। পরিদর্শনকালে কম্পিউটার ল্যাব, ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ও পদার্থ ল্যাবে ক্লাস হচ্ছিল।প্রতি তলায় পানি খাবার ব্যবস্থা আছে, আছে টয়লেট সুবিধাও। ল্যাব-শ্রেণীকক্ষসমূহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ভর্তি অফিসের কর্মকর্তারা তুলনামূলক কম স্মার্ট। স্মার্ট ব্যবস্থাপনাও অনুপস্থিত। প্রসপেক্টাস চেয়েও পাওয়া যায় নি। সস্তাদরের ব্রোশিয়ার দিয়ে তারা কাজ চালাচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট কম্পিউটার ভিত্তিক নয়। খাতা কলম ধরে ভর্তি হচ্ছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩ হাজারের মত। শিক্ষকগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিক্ষদের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য ভর্তি অফিস দিতে পারেনি। ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় যাবার জন্য লিফট রয়েছে। এসব তলায় শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। শ্রেণীকক্ষে হোয়াইট বোর্ড রয়েছে, শিক্ষার্থীদের বসার জন্য রয়েছে চেয়ার। প্রতিটি ক্লাসরুমের ক্যাপাসিটি ৩০ জন শিক্ষার্থী। পরিদর্শনকালে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে তারা স্থানীয়। কেন 'প' ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হচ্ছেন তা জানতে চাইলে তারা বলেন- এখানে কোন সেশন জট নাই, খরচ কম, পড়াশোনার চাপ নেই। রেজাল্ট ভালো না তাই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্সও পাব না।

৪.২.৪ বিভিন্ন ধরণের লেনদেন ও জড়িত ব্যক্তি

বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় বিশ বছরের অধিক সময় যাবৎ শিক্ষা সেবা প্রদান করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিনিয়োগকারী উদ্যোক্তারার সরাসরিভাবে কোন ধরণের আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু তদারকির অভাব ও আইনি দুর্বলতার কারণে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন ও পরিচালনায় বিভিন্ন ধরণের আর্থিক লেনদেন হয়। তথ্যদাতার মতে, এই লেনদেনগুলোর পেছনে বিভিন্ন অংশীজনের একাংশ সম্পৃক্ত থাকে। বিভিন্ন ধরণের লেনদেন ও জড়িত ব্যক্তির ধরণ নিম্নে দেয়া হলো:

সারণি ৪.১: এ খাতে বিভিন্ন ধরণের লেনদেন ও জড়িত ব্যক্তি

লেনদেনের খাত	লেনদেনের পরিমাণ (টাকায়)
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন	১ কোটি-৩ কোটি
ভিসি, প্রোভিসি, ট্রেজারার নিয়োগ	৫০ হাজার-২ লক্ষ
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পরিদর্শন	৫০ হাজার-১ লক্ষ
বিশ্ববিদ্যালয় বিরুদ্ধে অভিযোগ নিস্পত্তি	১০ হাজার-৫০ হাজার
অনুষদ অনুমোদন	১০ হাজার-৩০ হাজার
বিভাগ অনুমোদন	১০ হাজার-২০ হাজার
পাঠ্যক্রম অনুমোদন ও দ্রুত অনুমোদন	৫ হাজার-১০ হাজার
ভুয়া সার্টিফিকেট	৫০ হাজার-৩ লক্ষ
টাকা দিয়ে অডিট করানো	৫০ হাজার-১ লক্ষ
এ্যাসাইনমেন্ট	৫০০ টাকা
পাশ করিয়ে দেয়া ও নম্বর বাড়িয়ে দেয়া	উপহার, নগদ অর্থ

৪.২.৫ উপসংহার

এ অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায় পাঁচ

তদারকি প্রতিষ্ঠান: মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত নীতিনির্ধারনী পর্যায়ের ও তদারকির কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ অধ্যায়ে তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

- **শিক্ষা মন্ত্রণালয়**

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানটির পর্যাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে। অনুমোদন, সুপারিশ পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তদারকি ও আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ, অডিট পর্যালোচনা ইত্যাদির জন্যে কর্মরত জনবল মাত্র ৭ জন। স্বল্প সংখ্যক জনবল দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু তদারকি কাজ করা সম্ভবপর নয়। এছাড়া তাদের অন্যান্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মামলা সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা, শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করা ও সনদ বাতিল করার মত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারা; আইন লঙ্ঘন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কার্যক্রম চালিয়ে গেলে শাস্তি প্রদান না করে বার বার আলটিমেটাম দিয়ে দায়িত্ব সম্পন্ন করা (নিজস্ব জমি ক্রয়, স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময়সীমা ও আউটার ক্যাম্পাস গঠন বন্ধ) উল্লেখযোগ্য।

অনিয়মগুলোর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্থায়ী সনদের জন্য চাপ প্রদান না করা; বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদনে রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিশেষ চিহ্ন দিয়ে অনুমোদনের ইঙ্গিত প্রদান, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ লেনদেন; ঘুষ প্রদান না করলে কাজ সম্পন্ন না হওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে কাগজপত্র গায়েব করা; মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসাজসে ইউজিসি কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ অদৃশ্য উপায়ে মীমাংসা হওয়া উল্লেখযোগ্য।

- **বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম**

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রদান করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রতিবেদন প্রদান করলেও কোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যেসব সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কাজ করার জন্য তাদের নিজস্ব আইন পরিবর্তন না করা বা নিজস্ব আইন তৈরি না করা। তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে কাজগুলো পরিচালনা করছেন। তাদের নিজস্ব আইন পরিবর্তন করলে তারা অধিক ক্ষমতায়িত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ও তদারকি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারতো বলে কমিশন মনে করে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পরিদর্শন ও তদারকির সার্বিক দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হলেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায় শুধু পরিদর্শন শেষে সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকায় কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারছে না। এছাড়া প্রয়োজনীয় এখতিয়ারের অভাব (ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকা), শুধু পরিদর্শন শেষে সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকা; বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে পৃথক বিধিমালার অভাব লক্ষ করা গেছে। জনবলের অভাবে ৭৯টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ও তদারকি করার ব্যাপক দায়িত্ব পালনের জন্যে মোট জনবল মাত্র ১৩, দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য (মেম্বার) মাত্র ১ জন। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবের মুখে অসহায়ত্ব কাজ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিক অর্থ ব্যয় করে নিয়োগকৃত দক্ষ আইনজীবির সাথে সরকার পক্ষীয় আইনজীবির দুর্বল অবস্থান রয়েছে। তদুপরি, ক্ষেত্রবিশেষে প্যানেল আইনজীবিদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। পরিদর্শন ও তদারকির কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আইনে না থাকলেও বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করেছে। কেনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এই অর্থ প্রদান করছেন আবার কেউ কেউ করছেন না। তবে অর্থ না দেয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসি বিভিন্ন অভিযোগের বিষয় তুলে হয়রানি করার অভিযোগ রয়েছে।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ, ও পরিবর্তনে ইউজিসির অবহেলা এবং বাধ্যতামূলক ভূমিকা না থাকা; কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে নমনীয়তা প্রদর্শন লক্ষ্যণীয়। একটি ঘটনায় দেখা গেছে, শীর্ষস্থানীয় খ্যাতনামা একটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানহানী ঘটবে বলে কোন পদক্ষেপ তারা নেয়নি। ইউজিসির সংশ্লিষ্ট দলিল/প্রতিবেদনে "মালিকানা দ্বন্দ্ব" "মালিক" শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে খাতটি মুনাফাভিত্তিক এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করা;

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি; ওয়েবসাইট হালনাগাদ না থাকা (বিধি ও নীতিমালা না থাকা); ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক তদারকি না করা (বার্ষিক চিঠি ও ফরমেট পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করা); পরিদর্শনের সময় এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপঢৌকন ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণ; পরিদর্শন শেষে সঠিকভাবে প্রতিবেদন না দেওয়া (অর্থের বিনিময়ে তথ্য গোপন রাখা এবং অবৈধ অর্থ আদায়ের জন্য সমস্যাগুলো জিইয়ে রাখা); শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাজে সমন্বয়হীনতা ও সুপারিশ আমলে না আনার (মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত কমিশনে না জানানো) অভিযোগ রয়েছে।

৫.২ উপসংহার

এ অধ্যায়ে তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ করে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায় ছয়

উপসংহার ও সুপারিশ

গবেষণায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত আইন বিবেচনায় এনে এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস/ স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা পর্যালোচনায় সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা গেছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও প্রশাসনিক বিষয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যালোচনায় ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রণালয়, ইউজিসি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একাংশের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এখাতে সরকারের সুষ্ঠু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার অভাব লক্ষ করা গেছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ ও মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে তবে গবেষণার ফলাফল সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য নয়।

৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণায় সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০১০ এ নতুন আইন হলেও কিছু সীমাবদ্ধতা এখনও রয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে অস্পষ্টতা এবং বিধিমালার অনুপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। অন্যান্য পর্যবেক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, অলাভজনক খাত হওয়া সত্ত্বেও মুনাফাভিত্তিক খাতে এটি পরিণত হয়েছে। ইউজিসি প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট আলোচনায় "মালিক" "মালিকানা দ্বন্দ্ব" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করা হচ্ছে। আইনে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের একক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সুযোগ করা হয়েছে। ভিসি/ প্রো-ভিসি/ সিন্ডিকেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ অধিকাংশক্ষেত্রেই আলংকারিক/ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নামমাত্র ভূমিকা তারা পালন করছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা, তদারকি ও সমন্বয়হীনতার অভাবে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতির উদ্ভব ও প্রসার ঘটছে। কার্যতঃ মুনাফাভিত্তিকে পরিণত হওয়ায় ট্রাস্টিবোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব, ক্যাম্পাস দখল ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে তদারকি /নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অসহায়ত্ব লক্ষ্য করা গেছে। সর্বোপরি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির অপর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক সক্ষমতা না থাকায় সুষ্ঠু তদারকির অভাব; অনুমোদনসহ ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ও রাজনৈতিক প্রভাব; বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে সমঝোতামূলক দুর্নীতির উদ্ভব ঘটেছে।

৬.২ অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ পর্যালোচনায় আইনি সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের অভাব; প্রতিষ্ঠাতাদের সামাজিক রাজনৈতিক প্রভাব; তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, সমন্বয়হীনতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি; আর্থিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতার অভাব বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। ফলে, বোর্ডের একাধিপত্য, অলাভজনক হলেও মুনাফাভিত্তিকে পরিণত, সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষা, সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতি, সুনির্দিষ্ট বিধিমালা ও সংবিধির অনুপস্থিতিতে অধিকতর অনিয়ম ও দুর্নীতি, সমঝোতামূলক দুর্নীতি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে অংশীজন কর্তৃপক্ষের একাংশের যোগসাজশে অনিয়মের মাত্রা বৃদ্ধি, অব্যাহত দুর্নীতি ও আর্থিক লেনদেন ঘটছে।

চিত্র ৬.১ অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

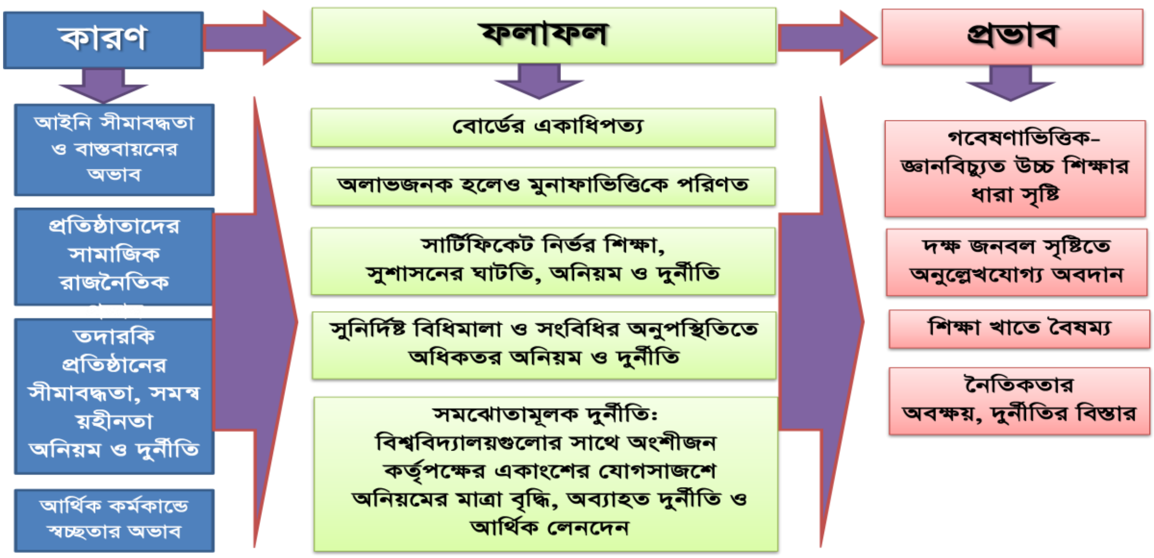

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ ফলাফল পর্যালোচনায় যেসব উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে সেগুলো হলো, গবেষণাভিত্তিক- জ্ঞানবিচ্যুত উচ্চ শিক্ষার ধারা সৃষ্টি, দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে অনুল্লেখযোগ্য অবদান, শিক্ষা খাতে বৈষম্য, নৈতিকতার অবক্ষয়, দুর্নীতির বিস্তার, প্রতিষ্ঠার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারা।

৬.৩ সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে থেকে উত্তরণের জন্য নিচের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হচ্ছে।

১. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্নাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
২. অবিলম্বে এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
৩. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ সংশোধনপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বোর্ড অব ট্রাস্টির একক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
৪. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ইউজিসি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে যে কমিটি সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি নিয়মিত রিভিউ এবং নিশ্চিত করবেন।
৫. নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করে ইউজিসির জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। ইউজিসির এখতিয়ার বৃদ্ধির মাধ্যমে নিয়ম লঙ্ঘনে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
৬. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব দূর করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
৭. সব ধরনের আউটার ক্যাম্পাসগুলির কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতি সম্পন্ন করতে হবে।
৮. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধ করণে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত সনদ প্রদানের পূর্বে বহিঃস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষককে সম্পৃক্ত করতে হবে।
৯. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সকল প্রকার আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে ।
১০. ভিসি, প্রো-ভিসি এবং অন্যান্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন করতে হবে।
১১. অডিট প্রতিবেদনসহ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল ধরনের তথ্য উন্মুক্ত ও প্রবেশযোগ্য করতে হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন তথ্যকর্মকর্তার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
১২. খন্ডকালীন নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে আইনানুযায়ী পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং খন্ডকালীন শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করে দিতে হবে।
১৩. সাধারণ তহবিল হতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়নে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ তহবিল ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইউজিসিতে নিয়মিত প্রেরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
১৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি এবং ছাত্রবেতন ও অন্যান্য ফি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একক বেতন ও ফি কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
১৫. বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্যে একই ধরণের শর্তাবলি যুক্ত করতে হবে এবং কেবলমাত্র উচ্চ রেটিংসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই অনুমতি প্রদান করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ইউজিসির লোকবল, আইনি এখতিয়ার ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
১৬. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল প্রকার অংশীজনের যেমন নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, অভিভাবক, ইত্যাদির অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ।
২. জাতীয় শিক্ষানীতি ।
৩. ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ।
৪. জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) ।
৫. প্রধান ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহার ।
৬. ৩৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ।
৭. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ ।
৮. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত) ।
৯. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ ।
১০. গ্লোবাল করাপশান ব্যারোমিটার ২০১৩, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ।
১১. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনঃ শিক্ষা, ২০১৩ ।
১২. বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিকস (বেনবেইজ) ।
১৩. Private HE in Bangladesh the impact on HE governance & Legislation, Gazi Mahabubul Alam.
১৪. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০, আবুল কাসেম হায়দার ।
১৫. ওয়েবসাইট ।
১৬. সংবাদপত্র প্রতিবেদন ।